প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৬

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ : চারু খান

মুদ্রক : যতীন্দ্রনাথ পাল
ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিং ওআর্কস
৯৪ বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা-৬

সূচীপত্র

মূল অনুবাদকের ভূমিকা

বর্তমান জাপান সম্পর্কে বিদেশী পরিদর্শকের প্রতিক্রিয়া একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদে ভরা। আনন্দের মূলে রয়েছে জাপানের যা কিছু প্রাচীন, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রান্তর ও উদ্যানশোভার মধ্যে অবস্থিত মন্দিরসমূহ, অপূর্ব সুন্দর নাট্যমঞ্চ, জাপানী আতিথ্যের আন্তরিকতা ইত্যাদি। জাপানের এই সনাতন রূপে অধিকাংশ পরিদর্শক এতো মুগ্ধ যে, তাঁরা এদেশের ওপর গত ষাট-সত্তর বছর ব্যাপী প্রতীচ্য-প্রভাবের তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা আক্ষেপ করেন যে, আজকের জাপানী রমণী সুন্দর স্বদেশী কিমনো বর্জন করে পাইকারি হারে তৈরি আধুনিক পোশাকের স্তূপ থেকে নিজের পোশাক বেছে নেন; জাপানী বাড়িতে প্রায়ই আজকাল দেখা যায়, ইউরোপীয় আসবাবের অনুকরণে ভারি ভারি আসবাব দিয়ে বিদেশী কেতায় সাজানো একখানা ঘর, আর রাজপথে অসংখ্য ট্রামের ঘর্ঘর আওয়াজ ও লাউড-স্পীকারের চীৎকারে কান পাতা দায়। এই অভিযোগের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য, কেননা তা তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করে। কিন্তু এ-বিষয়ে এঁরা সচরাচর যে উদ্ধত উষ্মা প্রকাশ করে থাকেন তাকে কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না।

এশিয়ার সমগ্র জাতির মধ্যে প্রতীচীর সঙ্গে জাপানই আজ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ,—কেবলমাত্র বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক প্রগতির দিক দিয়ে নয়, সক্রিয় সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রেও। বইয়ের দোকানগুলো যাবতীয় ইউরোপীয় (বিশেষত ফরাসী) সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থে ভর্তি, তার মধ্যে আধুনিকতম এবং দুরূহতম বিষয়বস্তুও বাদ পড়ে না। ডেবুসি ও স্ট্রাভিন্স্কি যদি না-ও হয়, অন্তত

বিটোফেন্, ব্রাম-এর রেকর্ড শোনবার জন্য অসংখ্য ছাত্র কফি-হাউসে ভিড় জমায়। ব্যাঙ্কগুলো পর্যন্ত রেনোয়া, ভ্যান গগ্, মাতিসের শিল্প-কীর্তিগুলোর উৎকৃষ্ট প্রতিরূপ ক্যালেণ্ডারের গায়ে ছাপিয়ে সারা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ কতখানি সাধারণের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পেরেছে। আজকের কোনো চাষা তার পূর্বপুরুষের তুলনায় গ্যেটে বা মানে-কে কতটুকু বেশি চিনেছে। আসল কথা হলো যে জাপানে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সর্বত্র দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা এবং সময়-সময় তা আন্তরিক অনুরাগে রূপান্তরিত।

এই নির্বিচার অনুকৃতির ফলে জাপানী নিসর্গ বেশ কিছুটা বিকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই এবং এর সবটুকু নিশ্চয়ই বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু বিদেশী পরিদর্শকের চোখে যে-সব জিনিস নিন্দনীয়, তার আগাগোড়াই যে পশ্চিমের প্রতি অন্ধ মোহ এ-কথা বলা যায় না। যে-জাপানী তরুণী প্রথাসিদ্ধ কিমনো বর্জন করেছে সে যে শুধু হলিউডের চিত্র-তারকাকে অনুকরণ করেছে তা নয়—দীর্ঘ পোশাকের আড়ম্বর, বহির্বাস ও অন্তর্বাসের বাহুল্য থেকে সে ও মুক্তি চায়। কারণ গ্রীষ্মকালে কিমনোয় অসম্ভব গরম এবং অফিসে-বাসে যাতায়াতে এই পোশাক সব সময়েই অনুপযোগী—আধুনিক জীবন ধারার সঙ্গে তাকেও তো পা মিলিয়ে চলতে হবে। যদি সে রোজ কিমনো পরতেও চায়, তাহলেও রেশমি কাপড়ের প্রচণ্ড দুর্মূল্যতা এই প্রথাগত পরিধেয়কে প্রায় বিলাসের সামগ্রী করে তুলেছে। কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে পেলে অন্য কথা, না হলে সাধারণের পক্ষে কিমনোর খরচ জোগান দুরূহ।

রুচি, সুবিধা ও অর্থনৈতিক তাগিদে জাপান প্রতিদিনই পরিবর্তিত হচ্ছে। বাইরের আবরণের অন্তরালে অতি ধীরে-ধীরে

দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও অনুরূপ পরিবর্তন চলছে। পারিবারিক জীবনধারা ভেঙে যাচ্ছে—বিশেষত বড়ো বড়ো শহরে এবং সঙ্গে-সঙ্গে চিরন্তন মূল্যবোধেও ভাঙন ধরেছে। যেমন অসুখী বিবাহের বিকল্প হিসেবে মেয়েদের পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত হয়েছে (অন্তত টোকিওতে), যদিও সেদিন পর্যন্ত স্বামীর তরফ থেকে ঘোরতর বিশ্বাসহীনতা ও অন্যান্য অসম্মান পরিবারের স্বার্থে স্ত্রীকে মেনে নিতে বাধ্য করা হতো। সারা দেশে এ চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়তে এখনও অনেক দেরি আছে, কিন্তু আজ অতি অল্পসংখ্যক নওজোয়ানই বাপ-মায়ের সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করে।

ধর্মের কথা বলতে গেলে, ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক, ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত এ-বিষয়ে যেটুকু আগ্রহ দেখা যায়, জাপানে সেটুকু পাওয়াও দুষ্কর। বেশির ভাগ জাপানাই নামেই বৌদ্ধ এবং যদিও উক্ত ধর্মের রীতি অনুসারে তাদের কবর দেওয়াই বিধি, তবু ধর্মে যথার্থ আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের (অন্যান্য দেশের তো বটেই) প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়কদের মতো জাপানের প্রধান মন্ত্রীও দেশের জনকল্যাণে দেবতার—যে-কোনো দেবতাই হোন না কেন, আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন, তবে সে দেশের লোকে আশ্চর্য তো হতোই, এমন কি হয়তো বিদ্রূপ করতেও ছাড়তো না। ভেবে অবাক লাগতে পারে যে, পশ্চিমের সব কিছুর মতো খ্রীস্টধর্মকেও জাপান ততোটা গ্রহণ করলো না কেন। এই শতকের গোড়ায় যখন অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরা চার্চহীন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মে ঘোরতর বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, আসলে তারপর থেকেই খ্রীস্টধর্ম বিষয়ে আগ্রহে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। খ্রীস্টধর্মের এই বিশেষ রূপটি উত্তরপুরুষদের মনঃপূত হয়নি, কারণ শৈশবে বাইবেল পাঠের স্মৃতি তাদের মন থেকে মুছে না গেলেও বর্তমান যুগের সমস্যার উপযুক্ত সমাধান তারা এর মধ্যে খুঁজে পায়নি।

"অস্তগামী সূর্যে" বর্ণিত চরিত্রগুলো অনেকদিক থেকে অসাধারণ, আবার প্রত্যেকেই আধুনিক জাপানের সার্থক প্রতিনিধি। কাজুকো নামে যে মেয়েটি গল্প বলছে, তার কথার ভাবে মনে হয় সে যেন কিমনোর চেয়ে বিদেশী পোশাকেই বেশি অভ্যস্ত। বইটি পড়তে পড়তে "গেনজির উপাখ্যানে"র কথা যেরকম মনে পড়ে ঠিক সেই রকম মাঝে-মাঝে শেখভ-বালজাকের কথাও মনে হয়। পশ্চিমী ভাষায় জোর দখল না থাকলেও এমন নিশ্চিন্তভাবে সে ফরাসী ইংরেজি বাগ্‌ধারা ব্যবহার করে যেন সবাই তার ভাষা বুঝবে। অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যবহার এবং জীবনেব পরম মুহূর্তে ভাবপ্রবণতায় সে খাঁটি জাপানী। জাপানীদের মধ্যে ঘরোয়া-জীবনে মনের আদান-প্রদান প্রায় অসম্ভব বলে (কোনো বিরল মুহূর্তে অসহ্য আবেগে যখন সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় তখনকার কথা আলাদা) কাজুকো, তার মা এবং ভাই-ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। আর সেই কারণেই লেখক ওসামু দাজাই ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে ডায়েরি, চিঠি ও জবানবন্দি। যদিও চরিত্রগুলোকে তিনি অসাধারণ ভাবে জীবন্ত রূপ দিতে পেরেছেন, তবু জাপানী জগতের অনেক কথাই যেন না বলা রয়ে গেছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির কাছে "অস্তগামী সূর্য" অনেকাংশে ঋণী—কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে এটি খাঁটি আধুনিক জাপানী উপন্যাস। ঘরে-বাইরের জাপানী জীবনযাত্রা যখন কম-বেশি দ্রুতিতে পশ্চিমী ঘেঁষা হয়ে উঠছে, তখন একজন পাশ্চাত্য পাঠকের কাছে এই পরিবর্তন খুব বিস্ময়কর—জাপানী জীবন তার এতো কাছে অথচ এতো দূরে!

কাজুকো নিজের ও তার প্রেমিক সম্বন্ধে বলেছে, "যুগসন্ধির নীতিবোধের বলি" এবং আমাদের মনে হয় সে কথা সত্যি।

পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সাময়িকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে এখনও দেরি আছে। আধুনিক ভাবধারা জাপানী অভিজাত সম্প্রদায়কে কিভাবে বিনাশ করেছে, "অস্তগামী সূর্য" তারই বলিষ্ঠ চিত্রণ। ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে উপন্যাসটি সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই উপন্যাসের ফলেই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত-তন্ত্রকে বোঝানোর জন্যে "অস্তগামী সূর্যের মানুষ" কথাটি প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে, এমন কি অভিধানেও স্থান পেয়েছে। কাজুকো, তার মা, ভাই নাওজি—এরা কেবল যে অভিজাত-গোষ্ঠীর প্রতীক তা নয়, যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর মুদ্রা-স্ফীতি আর ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থাগুলোর ফলে জাপানের যে বিরাট এক শ্রেণীকে দারিদ্র্য বরণ করতে হয়, এরা তাদেরই সার্থক প্রতিনিধি।

উপন্যাসটি পড়তে-পড়তে এ ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসে যে, লেখক ওসামু দাজাই কাহিনীকার মাত্র নন, তিনিও কাহিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। তাঁর জীবনী আলোচনা করলে এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে উত্তর জাপানের এক সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্র-জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে উৎকেন্দ্রিক স্বভাবেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাঁর ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় করে তোলে। কুড়িতে পা দেবার আগেই তিনি দু-দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৩০ সালে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। এই বিষয়-নির্বাচনের আগে দাজাই ফরাসী ভাষা আদৌ জানতেন না (এবং আপাতভাবে, বিদ্যাভ্যাসে সম্পূর্ণ অবহেলার জন্য কয়েকটি মাত্র শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছুই শেখেন নি) কিন্তু সে-সময়ে ফরাসী সাহিত্য বহু জাপানী ছাত্রের প্রিয় বিষয় ছিলো। এর কিছুটা কারণ হয়তো ইংরাজী সাহিত্যের কাঠখোট্টা

বস্তুধর্মিতার তুলনায় ফরাসী প্রতীকবাদ বা পরাবাস্তবতাকে জাপানী চরিত্রের অধিকতর উপযোগী মনে হয়েছে এবং ক্লাসিকাল জাপানী সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক দুরূহতার চেয়ে উক্ত কারণই বেশি দায়ী ; তাছাড়া জাপানের সর্বত্র মোহিনী প্যারির বাধা-বন্ধনহীন বহমান জীবনধারা বিষয়ে দুর্বলতাও অন্যতম কারণ।

১৯৩৫ সালে দাজাই ডিগ্রি না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ পাঁচ বছরের মধ্যে একটা বক্তৃতাও শোনেননি, একথা তিনি সগর্বে বলে বেড়িয়েছিলেন। তার বদলে তিনি সময়টা কাটিয়েছিলেন সাহিত্যিক এবং বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে। তাঁর গল্পগুলি যখন ক্রমশ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, ঠিক সেই সময়ে ১৯৩৫ সালে তিনি আরেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। একটা খামের মধ্যে "অধোগামী বর্ষ-সমূহ" নাম দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন চোদ্দোটি গল্পের সংগ্রহ, মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবার জন্য। ইতিমধ্যে তিনি মর্ফিয়ার নেশা ধরেছিলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পুরো দু-বছর তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ও বাড়িতে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে তিনি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবার তাঁর সঙ্গে ছিলো তাঁর গত ছ-বছরের পুরনো রক্ষিতা ; পরের বছর তাঁর বিয়ে হয় এবং সে স্ত্রী এখনো জীবিতা।

উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের দরুন দাজাইকে অনেক দুর্নামের ভাগী হতে হয় এবং জনসমাজে বেশ কিছুটা অপ্রিয়ও হন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জাপানের সঙ্কটের সময় এই ঘটনা ঘটে। বহুদিনের পুরনো বুকের রোগের জন্য তাঁকে সৈন্যবিভাগ থেকে রেহাই দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ভেসে বেড়াতে হলেও লেখা প্রকাশের কাজ তিনি চালিয়ে যান।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য প্রচেষ্টা শুরু হয় যুদ্ধের পর। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয় তাঁর শাণিত ছোটগল্প "ভিলনের স্ত্রী" (পরে নিউ ডিরেকশনস্ নামক সংকলনের ১৫ নং সংখ্যার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে)। পরে সেই বছরেই বর্তমান গ্রন্থ "অস্তগামী সূর্য" প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ খ্রীঃ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "বাতিল" প্রকাশিত হয় এবং অনেক সমালোচকের মতে এই গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠতর। "গুড্ বাই" এই ইংরাজি নামে তিনি আরো একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। উচ্ছৃঙ্খলতা, অতি শ্রম ও অনিদ্রায় তাঁর চেহারা এমন ভেঙে পড়লো যে, তাঁর বন্ধুরা শঙ্কিত হলেন। যুদ্ধের আগে তাঁর যক্ষা হয়েছিল এবং তিনি দাবি করতেন যে, মদ্যপান শুরু করে এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এতোদিনে আবার সেই রাজব্যাধি দেখা দিলো। নির্ভুল তার লক্ষণ সব ধরা পড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের জুন মাসে টোকিওর তামাগাওয়া জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি আত্মহত্যা করেন—নিয়তির পরিহাসে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হলো ১৯শে জুন—তাঁর উনচল্লিশতম জন্মদিনে।

যদিও শিল্পী হিসেবে (শুধু ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেননি, তবু দাজাই-এর নিজের জীবন ও সাহিত্য কীর্তি গুলির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে "অস্তগামী সূর্য" অন্যতম। কিন্তু এখানেও নাওজির মধ্যে তাঁর গুরু ঔপন্যাসিক উয়েহারার মধ্যে এমন কি বোন কাজুকোর মধ্যেও আমরা দাজাই-এর ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার স্পষ্ট পরিচয় পাই। নিজে প্রায়-অভিজাত পরিবারে জন্মেও দাজাই আপন শ্রেণীর অবক্ষয়ের চিত্রই এঁকে গেছেন। স্বরচিত চরিত্রগুলোর ভাবাবেগে তিনি কি পরিমাণ অংশ নিয়েছেন বারবার সে কথা ভেবে আমরা অবাক হই।

নাওজি যখন বারবার বেঁচে থাকার অসারতা সম্বন্ধে বলে, তখন মনে হয় এ যেন সেই লেখকেরই আত্মকথা, যিনি প্রায়শই আত্মহত্যায় পরিত্রাণ খুঁজেছেন। দাজাই-এর অন্য লেখাগুলি যতোই উজ্জ্বল হোক, একটা অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা থেকে "অস্তগামী সূর্য" মুক্ত,—সে হলো কাজুকো-চরিত্রের দৃঢ়তা। এক অপ্রমেয় শক্তির পরিচয় আমরা এখানে পাই, যার বলে সে তরুণী বরং সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবে, তবু মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। দাজাই স্বয়ং বামপন্থী আন্দোলনে অতি অল্পকাল যৎসামান্য অংশ গ্রহণ করেই সংগ্রামের সকল শক্তি হারিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায় ফুটে উঠেছে তীব্র নৈরাশ্য।

একথা সত্য যে দাজাই ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছে ঋণী, কিন্তু জাপানী ক্লাসিকসের সঙ্গে (যে বিষয়ে তিনি সুপঠিত ছিলেন) তাঁর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের কথাও অস্বীকার করা চলে না। পাশ্চাত্য পাঠকের কাছে তাঁর লেখার ধরন অসুবিধাজনক নয়, কিন্তু তাঁর লেখার সম্পূর্ণ নিজস্ব এমন একটি ভঙ্গি আছে, যা পশ্চিমে একেবারে অপরিচিত না হলেও হয়তো বা অপ্রচলিত। তিনি কখনো কখনো শেষ বা চরম মন্তব্যের প্রথমেই উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেন, পরে সেই বিশেষ ঘটনা-পরম্পরার বিশদ বর্ণনা দেন। এ ধরনের লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত বলে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর এতো অনুরাগ। দাজাই-এর লেখার আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়; অনেক বড়ো ঘটনার পূর্বাভাসস্বরূপ তিনি অতি সামান্য ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেন (যেমন সাপের ডিম পোড়ানো, মায়ের হাত ফুলে যাওয়া, ইত্যাদি)। এই রচনা পদ্ধতি তিনি জাপানী কবিতা থেকে নিয়েছেন, বিশেষত সতেরো সিলেব্‌লের ছোটো কবিতা হাইকু থেকে, যার প্রত্যেকটি শব্দ পূর্ণ কবিতাটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কারণ কবি এই কয়েকটি সুনির্বাচিত শব্দের ভেতর দিয়ে এমন এক কাব্য-জগতের

নির্দেশ দেন, যেখান থেকে কোঁটা-কোঁটা করে যেন চোয়ানো কবিতাটি।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, সমসাময়িক জাপানী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হলেন দাজাই—এবং স্বল্পায়ু হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই সিদ্ধি অর্জন করেছেন। তাঁর মন বিচিত্র পথসঞ্চারী। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিবিধ স্থান ও পরিবেশের অবতারণা করেছেন—শহরের কোনো সেকেলে অট্টালিকা, গ্রামের বাড়ি, টোকিওর ছোট্ট খুপরি, শস্তার ভাড়িখানা এবং সর্বত্র পরিবেশের যথাযথ চিত্রণ লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য পাঠককে আমার অনুরোধ এই যে, আজকের জাপানের হুবহু ছবি যদি তিনি চান, তাহলে, যেন দাজাই-এর রচনা পাঠ করেন; যদিও আধুনিক জাপানের অন্তঃচিত্রণ আমরা অন্যান্য গ্রন্থেও পেয়ে থাকি বা পাওয়া সম্ভব। "অস্তগামী সূর্যের" বিষয়গত সীমাবদ্ধতা এবং কয়েকটি চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও জীবনবোধের গভীরতায় এই গ্রন্থ সমগ্রভাবে জাপানী জাতিকে উপলব্ধি করতে এবং বিভিন্ন দিক থেকে তাকে চিনতে সাহায্য করে। এই কারণে সর্বশ্রেণীর জাপানীর কাছে এই উপন্যাসটি এতো জনপ্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু যাঁরা বহুদূরের এক অর্দ্ধ-পরিচিত দেশের কথা জানতে চান তাঁরা একে শুধু একটা সামাজিক দলিল বলে মনে করবেন না। আধুনিক জাপানী সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাবান লেখকের রচিত এটি একটি সুন্দর এবং শক্তিশালী উপন্যাস এবং বিশ্ব-সাহিত্যেও এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় | সাপ

খাবার ঘরে স্যুপ খেতে খেতে মা যেন অস্ফুট একটু শব্দ করে উঠলেন। স্যুপে কিছু পড়েছে ভেবে আমি জিগগেস করলাম, "চুল ?"

"না"। যেন কিছুই হয়নি এইভাবে মা এক চামচ স্যুপ মুখে দিলেন। সেটুকু শেষ হলে ঘাড় কাত করে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাইরে ফুলে ফুলে ছাওয়া চেরি গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন, আর ঐ অবস্থাতেই আরেক চামচ স্যুপ ঠোঁটের ফাঁকে চালান করে দিলেন। "মহিলা পত্রিকা"য় নির্দেশিত মেয়েদের স্যুপ খাবার পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথায় মা স্যুপ খান এবং তাঁর খাবার ধরনকে পাখির ডানা ঝাপটানো বললে অত্যুক্তি হবে না।

আমার ছোটো ভাই নাওজি একবার নেশার ঘোরে বলেছিল যে, "নামের সঙ্গে খেতাব জোড়া থাকলেই কিছু আর অভিজাত হওয়া যায় না। শুধু মাত্র প্রকৃতিদত্ত স্বভাব নিয়ে অনেক মানুষ যথেষ্ট অভিজাত; আবার আমাদের মতো আরও অনেকে খেতাব মাত্র সম্বল করে চণ্ডালেরও অধম বনে আছি। যেমন ধরো ইয়াশিমা, (ওর ইস্কুলের সহপাঠী এক কাউন্ট)—ওকে দেখে রাস্তার যে-কোনো বেশ্যার দালালের চেয়েও বেশি অশ্লীল লাগে না কি? হতভাগা মূর্খটা তার কোন আত্মীয়ের বিয়েতে মার্কিনী ডিনার জ্যাকেট পরে এসেছিল। পোশাকটার যদি বা কোনো অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু খাবার টেবিলে যেভাবে ভারি ভারি শব্দের ধাঁধা লাগিয়ে বক্তৃতা চালালো, তাতে আমার তো রীতিমত গা গুলিয়ে উঠছিল। এই জাতীয় শস্তা বাহাদুরির সঙ্গে সংস্কৃতির কোনো যোগ নেই। ইউনিভার্সিটির চারপাশে যেমন "উচ্চ শ্রেণীর

নিবাস" লেখা সাইনবোর্ডের ছড়াছড়ি, তেমনি অভিজাত বলতে আসলে বোঝায় উঁচুদরের ভিখারীর দল। খাঁটি নীল রক্ত যাদের গায়ে আছে তারা ইয়াশিমার মতো হামবড়াই করে না। আমাদের পরিবারে একমাত্র মা-ই হলেন খাঁটি সোনা। তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আমাদের কারো নেই।

স্যুপ খাওয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন। আমরা শিখেছি প্লেটের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে চামচটা আড়াআড়ি ধরে অল্প একটু স্যুপ তুলে মুখে দিতে। মা কিন্তু মাথা খাড়া রেখে, সোজা হয়ে বসে, বাঁ হাতের আঙুলগুলো আলতোভাবে টেবিলে রেখে প্লেটের দিকে না তাকিয়েই স্যুপ খান। এতো তাড়াতাড়ি ও পরিচ্ছন্নভাবে মা চামচেতে স্যুপ তোলেন যে পাখির ঠোঁটের সঙ্গে দিব্যি তার তুলনা চলে। চামচটাকে সোজা মুখের সামনে ধরে আলগোছে সেখান থেকে স্যুপটা ঠোঁটের ফাঁকে চালান করে দেন। তারপর চারিদিকে আনমনা দৃষ্টি বুলিয়ে পাখির ডানা ঝাপটানোর মতো চামচটাকে ফটফট করে ঝেড়ে নেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, এক ফোঁটা স্যুপ তো বাইরে পড়েই না; চুমুক দেবার শব্দও হয় না; এমন কি প্লেটের ওপর চামচ নামিয়ে রাখার শব্দও না। হয়তো অভিজাত সমাজের আদব-কায়দার সঙ্গে মায়ের স্যুপ খাওয়ার ধরনটুকু মেলে না, কিন্তু আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। এইটুকুই যেন সবচেয়ে খাঁটি; বাস্তবিকই প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাবার চেয়ে মায়ের মতো সোজা বসে খেলে স্যুপটাতে যেন অনেক বেশি স্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু, নাওজির ভাষায়, উঁচুদরের ভিখারী হবার দরুন মায়ের মতো অনায়াসে স্যুপ খাওয়া আমার হয়ে ওঠে না। ভদ্র সমাজের চলতি রেওয়াজ অনুসারে গোমড়া মুখে প্লেটের ওপর ঝুঁকেই খাই। শুধু স্যুপ কেন, মায়ের যে কোন খাবার ধরন টেবিলি-কেতার বাইরে। মাংস পাতে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ছুরি-কাঁটার সাহায্যে ছোটো

ছোটো টুকরো করে নেন, তারপর কাঁটাটিকে ডান হাতে ধরে স্বচ্ছন্দে একটার পর একটা টুকরোর সদ্ব্যবহার করেন। আবার আমরা যতক্ষণ শব্দ না করে মুরগির হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে হিমসিম হচ্ছি, ততক্ষণে মা দিব্যি নির্বিকারভাবে হাড়টি হাতে তুলে নিয়ে-মাংসতে কামড় বসান। মায়ের এই অভব্য আচরণ কেবল যে শোভনই লাগে তা নয়, কেমন যেন মনকেও স্পর্শ করে। নির্ভেজাল পদার্থে নিয়মের ব্যতিক্রম থাকলেও বেমানান হয় না।

অনেক সময় মনে হয়েছে হাতে খেলে খাবারের স্বাদ বুঝি বেশি ভালো লাগে, কিন্তু ভয় পাই পাছে মাকে বিশ্রী ভাবে নকল করতে গিয়ে উঁচুদরের ভিখারীকে সোজাসুজি পথের কাঙালিনীর মতো দেখায়।

আমার ভাই নাওজির মতে মায়ের সঙ্গে আমাদের নাকি কোনো তুলনাই চলতে পারে না, মাঝে-মাঝে নকল করতে গিয়ে নাকাল হয়েছি একথা ঠিক। একবার শরতের শুরুতে আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ির পেছনের বাগানে পুকুর পাড়ের আটচালায় বসে মা আর আমি জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের শোভা দেখছিলাম। হঠাৎ মা কাছাকাছি একটা ফুটন্ত ফুলের ঝাড়ের কাছে গিয়ে হাসতে-হাসতে সেখান থেকে আমায় ডাক দিলেন, "কাজুকো বলোতো তোমার মা এখন কি করছেন?"

"ফুল তুলছেন।"

মা এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন, 'উঁহু, উঁহু'। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হলো যে মার মধ্যে শ্রদ্ধা করার মতো এমন কিছু আছে, যা আমার পক্ষে নকল করা অসম্ভব।

সে কথা থাক, সকালের সূপ খাবার গল্প করতে বসে কোথায় সরে এসেছি! কিন্তু সম্প্রতি একটা বইয়ে পড়লাম ফরাসী রাজতন্ত্রের যুগে সম্ভ্রান্ত মহিলারা রাজোদ্যানে অথবা বারান্দার কোণে নিজেদের

ইচ্ছা করলেও আদৌ দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ধরনের সরলতা আমার ভারি ভালো লাগে এবং আমি অবাক হয়ে ভাবি মা বুঝি সেই যুগের মহিলাদেরই শেষ নিদর্শন। যাইহোক আজ সকালে স্যুপ খেতে-খেতে মায়ের অস্ফুট উক্তি শুনে যখন জিগগেস করলাম, "নুন নাকি ?" মা জবাব দিলেন—"না"। তবে কি নুন বেশি হলো ? রেশনে কচি কড়াইশুঁটি এক টিন পেয়েছিলাম, আজ সকালে তাই দিয়ে ঘন করে স্যুপ রেঁধেছিলাম, অল্প যে কটি বিষয়ে মেয়েরা নিজেদের ওপর ভরসা রাখতে পারে তার মধ্যে রান্না একটি ; কিন্তু নিজের ওপর সে ভরসা আমার নেই, সেই কারণেই মা ভরসা দিলেও স্যুপের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

গম্ভীরভাবে মা বললেন, "স্যুপটা চমৎকার হয়েছে।" সেটুকু শেষ করে সামুদ্রিক শাকে জড়ানো কয়েক দলা ভাত খেলেন। সকালে খেতে আমার কোনদিনই ভালো লাগে না, বেলা দশটার আগে খিদেও পায় না। আজ সকালে স্যুপটা তো কোনো রকমে গলা দিয়ে নামলো, কিন্তু আর কিছু খেতে যাওয়া ঝকমারি। কয়েক দলা ভাত প্লেটে নিয়ে চপস্টিক দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে চটকে ফেললাম। তারই একখণ্ড চপস্টিকে তুলে নিয়ে, মা যেমন করে স্যুপ খান সেইভাবে চপস্টিকটা মুখের সামনে ধরে পাখি খাওয়ানোর মতো মুখের ভেতর ঠেলে দিলাম। খাবার নিয়ে এই কাণ্ড করছি আর ওদিকে মা খাওয়া শেষ করে রোদে তেতে-ওঠা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ আমার খাওয়া দেখলেন চুপ করে।

"কাজুকো ওভাবে খেও না। সকালের খাবারটা সবচেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া উচিত।"

"মা তোমার তৃপ্তি হয় ?"

"আমার কথা ছেড়ে দাও"— আমি তো এখন সেরে উঠেছি।

"কিন্তু আমারতো কোনো রোগের বালাই নেই।"

"না না।" ম্লান হেসে মা ঘাড় নাড়লেন।

বছর পাঁচেক আগে ফুসফুসের রোগে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলাম, রোগটা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বাধিয়েছিলাম। মায়েরহালের অসুখটি বাস্তবিকই তাঁর স্নায়ু ও মনের ওপর যথেষ্ট চাপ দিয়ে গেছে। তবুও তাঁর যতো চিন্তা আমায় নিয়ে!

"ওঃ," আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো।

"কি হলো?" এবার মায়ের প্রশ্ন করার পালা। পরস্পরের চোখে চোখ পড়তে দুজনেই পূর্ণ সহানুভূতি অনুভব করলাম। আমি হেসে উঠতেই মা-র মুখে হাসি ফুটলো। দুশ্চিন্তা আমার মনকে নাড়া দিলেই ঐ ধরনের শব্দ আমার অজানতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বছর দুয়েক আগে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাগুলো হঠাৎ ছবির মতো মনের মধ্যে ভেসে উঠলো এবং আমি টের পাবার আগেই, মৃদু আর্তনাদ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের মুখের ঐ করুণ শব্দটুকুর অর্থ কি? তিনিও কি আমার মতো নিজের অতীতের কোনো অস্বস্তিকর ঘটনা মনে করছিলেন? না, তবুও কিছু কিন্তু আছে। "মা, এখখুনি তুমি কি ভাবছিলে?"

"ভুলে গেছি।"

"আমার কথা?"

"না।"

"নাওজির কথা?"

"হ্যাঁ।" তারপর, মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে একপাশে মাথা হেলিয়ে বললেন, "বোধহয়।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে-পড়তেই আমার ভাইয়ের যুদ্ধের ডাক আসে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের কোনো এক দ্বীপে তাকে পাঠানো হয়। তার কোনো খবরই আমাদের কাছে পৌঁছতো না। এমন কি

ধুধবিরক্তির পরও আজ অবধি সে নিখোঁজ। মা ধরে রেখেছেন ছেলের সঙ্গে আর এ জন্মে দেখা হবে না। অন্তত মুখে তাই বলেন, আমি কিন্তু একবারও হাল ছাড়িনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার সঙ্গে আবার দেখা হবেই।

"ভেবেছিলাম তার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি, কিন্তু তোমার ঐ সুস্বাদু স্যুপটা তার কথা মনে করিয়ে দিলো। আর সইতে পারলাম না। ওর দিকে আমার অনেক বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিলো।

হাই স্কুলে ঢোকার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নাওজির দারুণ সাহিত্য বাতিক শুরু হয় এবং সাহিত্যের নামে একেবারে গোল্লায় যায়। মায়ের দুঃখের কথা একমাত্র ভগবানই জানেন। এমন খারাপ ব্যবহার করার পরেও স্যুপ খেতে-খেতে মায়ের আবার তারই কথা মনে পড়লো এবং এমন আর্তনাদ! রাগে আমি জোর করে খাবারটুকু মুখে পুরে দিলাম, চোখ দুটোও কেমন জ্বালা করে উঠলো।

সে বহাল তবিয়তেই আছে। খাসা আছে নাওজি। ওর মতো হতভাগাদের মরণ নেই। যারা সৎ, যারা সুন্দর, যারা বিনয়ী তারাই আগে-ভাগে মরে। মাথায় লাঠি মারলেও তোমার নাওজির মরণ নেই!"

মা হাসলেন, "তার মানে তুমিই বোধহয় আগে যাবে।" আমায় চটাবার চেষ্টা।

"আমি কেন মরবো? আমি মন্দ, আমি কুৎসিত। আশীটা বছর হেসে খেলে কাটিয়ে দেবো।"

"সত্যি? তাহলে তোমার মায়ের পরমায়ু নব্বই বছর, কি বলো?" ঘাবড়ে গিয়ে আমি উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়ই।" হতভাগারা বহুকাল বাঁচে। সুন্দরেরা বাঁচে অল্প। মা আমার সুন্দরী, আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কি যে বলবো ভেবে পেলাম না।

চটে উঠে বললাম, "তোমাকে নিয়ে পারি না।" নীরুর ঠোঁটটা কেঁপে উঠলো, চোখ ছলছল করতে লাগলো।

সাপের গল্পটা করা উচিত হবে কিনা জানি না। দিন চার-পাঁচ আগে বিকেল বেলায় পাড়ার ছেলে-মেয়েরা বাগানের বেড়ার খুঁটিতে লুকানো বারো-তেরোটা সাপের ডিম খুঁজে পায়। তাদের বিশ্বাস যে ডিমগুলো বিষাক্ত সাপের। ভেবে দেখলাম, বারোটা সাপ যদি সারাক্ষণ বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায় তবে আগে থেকে সাবধান না হলে বাগানে ঢোকাই দায় হবে। বাচ্চাদের বললাম, "ডিমগুলি পুড়িয়ে ফেলা যাক – কি বলো?" বাচ্চারা হৈ হৈ করে আনন্দে নাচতে-নাচতে আমার সঙ্গে চললো।

ঝোপের কাছে একরাশ খড়কুটো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে একটার পর একটা ডিম ছুঁড়ে দিলাম। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেলো তবু সেগুলো পুড়লো না। বাচ্চারা বেশি-বেশি ডালপাতা দিয়ে আগুনটা উস্কে দিলো, ডিমগুলো তবু যেমনকার তেমনি রয়ে গেলো।

কিছু দূরে, রাস্তার ধারে জোতদার-বাড়ির মেয়েটি বেড়ার ওপার থেকে জিগগেস করলো—"ব্যাপারটা কি?"

"সাপের ডিম পোড়াচ্ছি। ভয় হয় পাছে ডিম ফুটে বিষাক্ত সাপে বাড়ি ছেয়ে যায়।"

"কত বড়ো ডিম?"

"সাদা ধবধবে হাঁসের ডিমের মতো বড়ো।"

"তাহলে ওগুলো ঢোঁড়া সাপের ডিম; বিষাক্ত নয়। কাঁচা ডিম পোড়ে না জানো তো?"

কি যেন একটা মস্ত তামাশার ব্যাপার, এইভাবে হাসতে-হাসতে মেয়েটি চলে গেলো।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলছে, তবু ডিম পোড়ার নাম নেই। আমি বাচ্চাদের দিয়ে ওগুলোকে আগুন থেকে বার করিয়ে বদরি

গাছের গোড়ায় ডিমগুলো পোঁতবার বন্দোবস্ত করলাম। কতকগুলো নুড়ি জোগাড় করে সমাধি-চিহ্নের ব্যবস্থা হলো।

হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে বললাম, "এসো সবাই মিলে প্রার্থনা করি।" আমি হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করলাম। বাচ্চারা আমার কথামত হাত জোড় করে পেছন দিকে বসে পড়লো। সব শেষে আমি বাচ্চাদের সঙ্গ ত্যাগ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম। সিঁড়ির মাথায় মটরলতার মাচানের ছায়ায় মা দাঁড়িয়েছিলেন।

আমায় বললেন,—"এ কি নিষ্ঠুরতা!"

"আমি ভেবেছিলাম বিষাক্ত সাপের ডিম, কিন্তু আসলে একেবারেই ঢোঁড়া সাপের ডিম। যাই হোক ভালো করে সমাধি দিয়েছি, মন খারাপ করার কিছু নেই।" মনে-মনে বুঝলাম মার দেখে ফেলা খুব খারাপ হয়েছে।

এমনিতে মার মনে কোনো কুসংস্কার নেই, কিন্তু দশ বছর আগে আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়িতে বাবার মৃত্যুর পর থেকে সাপ সম্বন্ধে মায়ের মনে কেমন যেন একটা আতঙ্ক আছে। বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে একটুকরো কালো সুতো পড়ে আছে ভেবে তুলে ফেলে দিতে গিয়ে মা আবিষ্কার করেন সেটা সুতো নয়, সাপ। ঘরের পাশের বারান্দা দিয়ে সাপটা সর্‌সর্‌ করে বেরিয়ে গেলো। শুধু মা আর আমাদের ওয়াদা মামার চোখে পড়েছিল। তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নীরব রইলেন, পাছে শেষ মুহূর্তে বাবার শান্তিভঙ্গ হয়। সেইজন্য আমি ও নাওজি (সে ঘরে থাকা সত্ত্বেও) সাপটার সম্বন্ধে কিছুই টের পেলাম না।

কিন্তু বাবা যেদিন মারা যান, সেদিন সন্ধ্যায় পুকুর পাড়ে বাগানের সব কটা গাছে আমি সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম বলে সাপের ব্যাপারটা আমার জানা আছে। এখন আমার উন-তিরিশ বছর বয়েস হলো. তার মানে দশ বছর আগে বাবা মারা

যাবার সময় আমার বয়েস ছিলো উনিশ। নেহাত ছেলেমানুষ ছিলাম না। দশটা বছর কেটে গেছে সত্যি, কিন্তু সেদিন যা যা ঘটেছিল, আজও স্পষ্ট মনে আছে, ভুল হবার যো নেই। পুকুর পাড়ে ঘুরে-ঘুরে বাবার শেষ কাজের জন্য ফুল তুলছিলাম। আজালিয়া ঝাড়ের কাছে আসতেই মগডালে জড়ানো একটা সাপ চোখে পড়লো। গাটা শিউরে উঠলো। সেখান থেকে এগিয়ে কেরিয়া গোলাপের একটা ডাল কাটতে গিয়ে দেখি, সেখানেও সাপ। শারনের গোলাপ, মেপ্‌ল, ক্রম্, উইস্‌টেরিয়া, চেরি পাশাপাশি প্রত্যেকটি গাছের ডালে, প্রতিটি ঝোপে একটা করে সাপ জড়ানো। খুব যে ভয় পেলাম তা নয়। ভাবলাম আমার মতো এই সাপের গোষ্ঠীও বুঝি বাবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পরে ফিশফিশ করে মাকে এই সাপেদের কথা বললাম। তিনি শুধু এক পাশে মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন, যেন কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন। মুখে অবশ্য কোনো মন্তব্য করলেন না।

তবু একথা ঠিক যে, এই দুটি ঘটনার পর থেকেই সাপের প্রতি মায়ের বিতৃষ্ণার সূত্রপাত হয়। কিংবা হয়তো এভাবে বললে ঠিক হবে যে, এর পর থেকে এদের সম্বন্ধে মায়ের মনে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও আশঙ্কা বাসা বাঁধে।

আমায় সাপের ডিম পোড়াতে দেখে নিশ্চয়ই তাঁর মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা জাগে। এ কথা খেয়াল হতেই বুঝতে পারলাম, ডিমগুলো পুড়িয়ে আমি কী সর্বনাশই না করেছি। হয়তো এর ফলে মায়ের কোনো অমঙ্গল ডেকে আনলাম। বেশ কিছুকাল এ দুশ্চিন্তা পেয়ে বসলো এবং এর পরেও আজ সকালে খাবার-ঘরে নির্বোধের মতো সুন্দরেরা আগে মরে এ মন্তব্য করে, তারপর যা-তা বলে তাঁকে চাপা দেবার চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে চোখের জলে ভাসালাম। পরে প্রাতরাশের বাসন সরাতে গিয়ে আতঙ্কে আমার

সারা গা কাঁটা হয়ে রইলো, মনে হলো যেন একটা কালো সাপ মায়ের অকালমৃত্যুর কারণ হবে এবং তার বাসা যেন আমারই বুকের মধ্যে।

সেদিনই বাগানে একটা সাপ দেখলাম। সকালটা ভারি সুন্দর স্নিগ্ধ দেখে রান্নাঘরের পাট সেরে, একটা বেতের চেয়ার লনে টেনে নিয়ে বসে-বসে উল বুনতে সাধ হলো। চেয়ার হাতে বাগানে পা দিতেই ক্যানাঝাড়ের পাশে একটা সাপ নজরে পড়লো। ঈষৎ বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেলো। গাড়ি-বারান্দায় চেয়ার টেনে সেখানেই বোনা নিয়ে বসলাম। বিকেলে বাগানের ওধারে লাইব্রেরি থেকে (জায়গাটা একটা গুদোমঘরে) মেরি লরেন্সিনের এক খণ্ড ছবির বই আনতে গিয়ে দেখি, একটা সাপ বুকে হেঁটে মাঠ পেরিয়ে চলেছে। এটা সেই সকালে দেখা সাপটা, সুন্দর, সাবলীল,—পরম নিশ্চিন্তে চলেছে। বুনো গোলাপ ঝাড়ের ছায়ায় এসে মাথা খাড়া করে আগুনের শিখার মতো দারুণ জিভ বের করে নাড়তে লাগলো। মনে হলো কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন চরম দুশ্চিন্তায় উঁচু মাথাটা নিচু করে মাটিতে পড়ে গেলো। মনে-মনে বললাম, নিশ্চয়ই সাপিনী। এক্ষেত্রেও সাপের সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গুদোম থেকে ছবির বইখানা বের করে ফেরার পথে সাপের জায়গাটায় চোখ বোলালাম, কিন্তু সে ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্ধ্যেবেলা মায়ের সঙ্গে চা খেতে বসেছি, বাগানের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, পাথরের সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে আবার সেই সাপটা সন্তর্পণে আত্মপ্রকাশ করছে।

মা ও সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, "সেই সাপটাই কি ?" বলতে-বলতে দৌড়ে আমার পাশে এসে, আমার হাত ধরে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। চট করে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আমার কাছে ধরা পড়ে গেলো।

আমি জিগগেস করলাম, "অর্থাৎ সেই ডিমদের মা ?"

অতি কষ্টে মা জবাব দিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ।" মার গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোচ্ছিল না।

নিঃশব্দে দম বন্ধ করে আমরা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাপটা একবার পাথরটা ঘুরপাক দিয়ে এবং তারপরেই নড়তে শুরু করলো। এলোমেলো গতিতে, দুর্বলভাবে সিঁড়ি পেরিয়ে ক্যানার ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। ফিশফিশ করে বললাম, "সকাল থেকে ওটা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা চেয়ারের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লেন। হতাশ সুরে বললেন, "ঠিক তাই হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি বেচারি ডিমগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে।" কি করবো ভেবে না পেয়ে বোকার মতো হেসে উঠলাম।

অস্তগামী সূর্যের আভা মায়ের মুখের ওপর পড়ে চোখ দুটি উজ্জ্বল নীল দেখাচ্ছে। ঈষৎ রাগ ফুটে ওঠা মুখখানা এমন অপরূপ হয়েছে যে, ছুটে গিয়ে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। এইমাত্র যে সাপটা দেখলাম, মনে হলো মায়ের বর্তমান চেহারার সঙ্গে তার কোথায় একটা মিল আছে। কি কারণে জানি না মনে হলো যে-কুৎসিত সাপটা আমার বুকের ভেতর বাসা বেঁধেছে, সে একদিন শোকে-দুঃখে জর্জরিত আমার এই মা সাপটিকে আত্মসাৎ করবে।

মায়ের কোমল সুগঠিত কাঁধের ওপর হাত রাখলাম। সে সময় আমার শরীরের ভেতর দিয়ে যে প্রচণ্ড আলোড়ন বয়ে গেলো, তা বোঝাবার ভাষা আমার নেই।

যে বছর জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে, সেই বছর ডিসেম্বর মাসে আমরা টোকিওর নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ইজুতে চীনা কেতার এই বাংলোয় উঠে এলাম। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মায়ের একমাত্র রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় ও ছোটো ভাই ওয়াদা মামা

আমাদের সম্পত্তির তদারক করছিলেন। যুদ্ধের শেষে সব কিছুরই পরিবর্তন হলো। মামা মাকে জানিয়ে দিলেন আগের মতো বাবুয়ানা আর চলবে না, আমাদের বাড়ি বিক্রি করে চাকর-বাকরদের জবাব দিয়ে দিতে হবে, সুতরাং দেশে-গাঁয়ে ছোট্টো একখানা বাড়ি কিনে নিজেদের মতো থাকাই সবচেয়ে ভালো হবে। টাকা-পয়সা সম্বন্ধে মা শিশুর চেয়েও অনভিজ্ঞ ছিলেন, কাজেই ওয়াদা মামার এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি যা ভালো বোঝেন, সেই ব্যবস্থাই করতে বলে দিলেন। নভেম্বর মাসে মামার কাছ থেকে এক জরুরি ডাকের চিঠি এলো, ভাইকাউণ্ট কাওয়াটার দেশের বাড়ি বিক্রির খবর নিয়ে। জায়গাটা দেখতে ভালো, জমিও উঁচু, প্রায় আধ একর চাষের জমি আছে। জায়গাটা বদরি ফুলের জন্য বিখ্যাত। শীতে গরম, গরমকালে ঠাণ্ডা থাকে। ওয়াদা মামা চিঠির শেষে লিখেছিলেন "আমার বিশ্বাস জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হবে। তবু ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার একবার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে। কাল একবার আমার আফিসে আসতে পারো?"

আমি জিগগেস করলাম,—"মা তুমি যাবে?"

অতি দুঃখে মা জবাব দিলেন,—"যাবো বৈ কি! সে ডেকেছে যে।"

পরদিন দুপুরের পরেই মা রওনা হলেন। আমাদের পুরনো ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে গেলো এবং সন্ধ্যে আটটা নাগাদ মাকে নিয়ে ফিরে এলো।

আমার ঘরে ঢুকে, ডেস্কের ওপর হাত রেখে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, মনে হলো এখুনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

"সব ঠিক হয়ে গেলো," এইটুকুই শুধু বললেন।

"কি ঠিক হয়ে গেলো?"

"সব।"

আমি অবাক হয়ে জিগগেস করলাম, "কিন্তু বাড়িটা একবার চোখের দেখাও দেখলে না?"

ডেস্কের ওপর কনুই তুলে, হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা উত্তর দিলেন, "তোমার ওয়াদা মামা বলছেন বাড়িটা ভালোই। মনে হচ্ছে চোখ খুলে কাজ নেই, যেমন আছি তেমনি সেখানে গিয়ে উঠতে হবে।" এতক্ষণে মাথা তুলে মৃদু হাসলেন। মায়ের মুখখানা অত্যন্ত কাতর ও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ওয়াদা মামার প্রতি মায়ের অন্ধ বিশ্বাস দেখে বিমূঢ়ভাবে উত্তর দিলাম—"তাতো বটেই।"

"তাহলে তুমিও চোখ বুজেই থেকো।"

এবার আমরা একসঙ্গে হেসে উঠলাম, কিন্তু হাসি থামতেই রাজ্যের অন্ধকার মনের ওপর চেপে এলো।

এরপর থেকে রোজ কুলিরা এসে বাড়ি বদলের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করলো। একদিন মামা নিজে এসে বিক্রির মাল-পত্তরগুলোর বিলি ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের ঝি ওকিমি আর আমি জামা-কাপড় গোছানো, আবর্জনা বাগানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা এইসব নিয়ে ব্যস্ত রইলাম, মা কিন্তু এতোটুকু সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। নিজের ঘরে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে কাটালেন।

একদিন আমি সাহস সঞ্চয় করে একটু রেগেই জিগগেস করলাম, "ব্যাপার কি?" তোমার কি 'ইজু'-তে যাবার ইচ্ছে নেই নাকি?"

একান্ত উদাসভাবে মা জবাব দিলেন—"না।"

যাত্রার তোড়জোড় করতে দিন দশেক কেটে গেলো। এক সন্ধ্যায় আমি আর ওকিমি কিছু বাজে কাগজ, খড় ইত্যাদি বাগানে নিয়ে পোড়াচ্ছি, এমন সময় মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে

দাঁড়ালেন এবং নিঃশব্দে জলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। পশ্চিম দিক থেকে একটা হিমেল হাওয়া উঠেছিল, ধোঁয়াটা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো। আমি মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম, এমন রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা বহুকাল চোখে পড়েনি।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "মা তোমাকে তো মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না।"

মা ম্লান হেসে জবাব দিলেন, "ও কিছু নয়।" তারপর আবার নিঃশব্দে ঘরে চলে গেলেন।

সে রাত্রে আমাদের বিছানা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল বলে ওকিমি একটা সোফায় শুলেন, মা আর আমি প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে আনা বিছানা মায়ের ঘরে পেতে শুলাম।

এতো ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠস্বরে মা কথা বললেন যে, আমি ঘাবড়ে গেলাম, "কেবল তোমার জন্মেই যাওয়া। তুমি আছো বলেই আমি ইজুতে যেতে রাজি হয়েছি।"

অভাবনীয় এই মন্তব্যে অবাক হয়ে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্ন করলাম, "আর ধরো যদি আমি না থাকতাম।"

হঠাৎ মা কেঁদে ফেললেন,—"আমার পক্ষে মরাই ছিলো সবচেয়ে ভালো। যে বাড়িতে তোমার বাবা শেষনিশ্বাস ফেলেছেন, সেখানে মরতে পারলে কোনো দুঃখ ছিলো না।" ভাঙা-ভাঙা কথা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে উচ্চারণ করলেন।

এমন কাতর স্বরে কথা বলতে বা এমন অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়তে মাকে আমি এর আগে কখনও দেখিনি। বাবার মৃত্যুর সময় নয়, আমার বিয়ের সময় না, সন্তানসম্ভবা হয়ে যখন তাঁর কাছে ফিরে আসি তখনও না, হাসপাতালে মরা ছেলে হলো, তখনও না; পরে যখন অসুখ হয়ে দীর্ঘকাল শয্যা নিই তখনও না।

এমন কি নাওজি যখন অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে, তখনও মাকে এতো কাতর দেখিনি। বাবার মৃত্যুর পর এই দশ বছর ধরে মা ঠিক বাবার জীবিত কালের মতোই শান্ত, স্বচ্ছন্দভাবে কাটিয়েছেন, নাওজি আর আমি সেই সুযোগে খুশিমত বেড়ে উঠেছি, কখনো কিছুতে মাথা ঘামাইনি। এখন মায়ের টাকা ফুরিয়েছে। এতোটুকু অসন্তোষ প্রকাশ না করে প্রতিটি পয়সা আমাদের দুই ভাই-বোনের জন্য খরচ করেছেন। যেখানে এতোকাল কাটালেন, আজ সেই সংসারের পাট গুটিয়ে সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় অজানা একটা ছোট্ট বাড়িতে দাস-দাসীর সম্পর্কমাত্র বিবর্জিত হয়ে দুঃখের সংসার পাততে বাধ্য হচ্ছেন। মা যদি স্বার্থপর ও কৃপণ হতেন, এবং আমাদের ওপর বকাবকি করতেন, কিংবা গোপন কোনো উপায়ে অর্থাগমের চিন্তা করতেন, তাহলে আজ সংসার উল্টে গেলেও মরণকে এমন আকুলভাবে ডাক দিতেন না। এই প্রথম আবিষ্কার করলাম অর্থাভাব কী মারাত্মক, শোচনীয় অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। বুকের ভেতর তোলপাড় হয়ে গেলো কিন্তু এতো উদ্বেগেও চোখে জল এলো না। আমার মনের এই অবর্ণনীয় অবস্থাকেই বোধহয় এতকাল ধরে "মানব-জীবনের মর্যাদাবোধ" নামক বস্তাপচা কথাটি ব্যবহার হয়েছে। সেইখানে ছাতের দিকে চেয়ে অনড় অচলভাবে শরীরটাকে পাথরের মতো শক্ত করে শুয়ে রইলাম।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, পরদিন মায়ের শরীর বেশ খারাপ হলো। এটা-ওটা নিয়ে মিথ্যে নাড়াচাড়া করে দেরি করতে লাগলেন যেন এ বাড়িতে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে অমূল্য, কিন্তু ওয়াদা মামা এসে জানালেন আমাদের সেইদিনই ইজুতে চলে যেতে হবে। প্রায় সব জিনিসই আগে রওনা হয়ে গেছে। স্পষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে মা কোটটা গায়ে দিলেন, তারপর কোনো কথা

মা বলে ওকি্মি, আর আমাদের বাকি চাকর-বাকর—যারা আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল, তাদের দিকে মাথা হেলিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

ট্রেনটা মোটামুটি খালিই ছিলো, সবাই আমরা বসার জায়গা পেলাম। মামার মেজাজটা বেশ শরিফ, গুনগুন করে 'নো' পালার গান ভাঁজছেন। এদিকে মায়ের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ দুটি নিচু করে উদাসীনভাবে বসে আছেন। নাগাওকাতে ট্রেন ছেড়ে বাসে উঠলাম, মিনিট পনেরো পর বাস থেকে নেমে হাঁটা পথে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। ছোটো একটা গ্রামের দিকে ধীরে-ধীরে পাহাড়ের চড়াই উঠে গেছে, তার শেষ প্রান্তে চীনা ধাঁচে তৈরি সুন্দর একটা বাংলো চোখে পড়লো।

ওপরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতেই বললাম, "যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর জায়গাটা।"

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মা বললেন, "সত্যিই তাই।" মুহূর্তের জন্য খুশিতে তাঁর চোখ ভরে এলো।

আত্মপ্রসাদে গদগদ হয়ে মামা বললেন, "প্রথম কথা হলো, বাতাসটা ভালো, যাকে বলে বিশুদ্ধ বায়ু।"

মা হেসে বললেন, "তাইতো চমৎকার প্রাণ-জুড়নো হাওয়া!"

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

টোকিও থেকে আমাদের যে জিনিসপত্র এসেছিল সেগুলো ভেতরে পেলাম। বাড়ির সামনে প্যাকিং কাঠের বাক্সের পাহাড় জমেছে।

মামা আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে আমাদের বসার ঘর দেখতে নিয়ে গেলেন।—"একবার বাইরে চেয়ে দেখো কী অপরূপ দৃশ্য!'

তখন বিকেল প্রায় তিনটে। শীতের শেষরশ্মি বাগানে এসে পড়েছে। বাগান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বদরি গাছে ঘেরা ছোট্ট পুকুরটার দিকে নেমে গেছে। তারপর আছে কমলালেবুর বাগান। একটা মেঠো রাস্তার পাশে ধানখেত, একটা দেবদারুর বন, সবশেষে দূরে সমুদ্র চোখে পড়ে। বসার ঘরে বসে সমুদ্রকে ঠিক আমার বুক বরাবর উঁচু মনে হলো।

নিস্তেজ গলায় মা বললেন, "ভারি স্নিগ্ধ দৃশ্য।"

অত্যধিক খুশি গলায় আমি সায় দিলাম, "নিশ্চয়ই বাতাসের গুণ। টোকিওর সূর্যের আলোর সঙ্গে এখানের আলোর কত তফাত দেখেছো? যেন রেশমি কাপড়ে ছেঁকে সূর্য তার রশ্মি আমাদের কাছে চালান করে দিচ্ছে।"

নীচের তলায় দুখানা বড়ো ঘর—একখানা চীনা ধরনের বৈঠকখানা আর একখানা হলঘরও আছে। দোতলায় বিদেশী কায়দার একটি ঘরে প্রকাণ্ড এক বিছানা। গোটা বাড়িটা এই, তবু আমার মনে হলো দুজনের পক্ষে বাড়িখানা নিন্দের নয়। এমন কি নাওজি ফিরে এলেও বেশি অসুবিধা হতো না।

সে গ্রামে একটিমাত্র হোটেল, মামা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে সেখানে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনজনের মতো কিছু খাবার এলো, বসার ঘরে বসেই মামা খেতে শুরু করে দিলেন। সঙ্গে তাঁর হুইস্কি ছিলো, তার সাহায্যে আহার্য অনায়াসে পাকস্থলীর পথ খুঁজে নিলো। উছলে ওঠা খুসির তোড়ে তিনি এ বাড়ির প্রাক্তন মালিক ভাইকাউন্ট কাওয়াটার সঙ্গে তাঁর চীন-অভিযানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের শুনতে বাধ্য করলেন। মা নামেই খেতে বসলেন এবং আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ফিশফিশ করে বললেন, "আমি একটু শুতে চাই।"

জিনিসপত্রের মধ্য থেকে বিছানাটা টেনে বের করে মায়ের

সঙ্গে ধরাধরি করে পেতে ফেললাম। তাঁর চেহারা দেখে কেমন যেন বুকটা ছাঁৎ করে উঠতে থারমোমিটার দিয়ে দেখি ১০২° ডিগ্রি জ্বর।

মামা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। যাই হোক, তিনি গ্রামের ডাক্তার খুঁজতে বেরোলেন। মাকে ডাকাডাকি করতে তিনি জ্বরের ঘোরে মাথা নাড়লেন মাত্র। মায়ের ছোটো হাতখানি নিজের মুঠিতে চেপে ধরে কেঁদে ফেললাম। মা, আমার হতভাগিনী মা ;—মাগো, আমরা দুজনেই হতভাগিনী। আমার কান্না আর থামতে চায় না। কাঁদতে-কাঁদতে মনে হলো মায়ের সঙ্গে আমিও এই মুহূর্তে মরণকে বরণ করে নিই। আর কিসের আশায় বাঁচা ? নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও বাঁচবার অর্থ ঘুচে গেছে।

প্রায় দু-ঘণ্টা পরে মামা এক গাঁয়ের ডাক্তার নিয়ে এলেন। ভদ্রলোককে যথেষ্ট বৃদ্ধ বলে মনে হলো। সেকেলে পোশাকী জাপানী জামা পরনে ছিলো।

"নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। যাই হোক ভয়ের কিছু নেই।" এ রকম অনিশ্চিত মন্তব্য করে মাকে একটা ইনজেকসন দিয়ে গেলেন।

পরের দিনও জ্বর নামলো না। মামা আমার হাতে দুহাজার ইয়েন্ (জাপানী মুদ্রা) দিয়ে বলে দিলেন হাসপাতালে পাঠাতে। দরকার হলে টেলিগ্রাফ করে তাঁকে খবর দিতে। সেদিন তিনি টোকিওতে ফিরে গেলেন। প্রয়োজনীয় যৎসামান্য বাসনপত্র বের করে অল্প একটু ভাতের ক্বাথ তৈরি করলাম। মাত্র তিন চামচ খেয়েই মাথা হেলিয়ে মা আর দিতে বারণ করলেন। দুপুরের আগে ডাক্তারবাবু আবার এলেন। এবার পোশাকের ঘটা কিছু কম, তবু শাদা দস্তানা জোড়া পরে আসতে ভোলেননি।

আমি বললাম, "মাকে হাসপাতালে ভর্তি করলে কেমন হয় ?" ডাক্তারবাবু বললেন, "না, তার দরকার হবে না। আজ একটা

কড়া ইনজেকশন দেবো, তাতেই জ্বরটা নেমে যাবে। আগের দিনের মতো আজও তাঁর কথায় বিশেষ ভরসা পেলাম না। কড়া ইনজেকশন দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

বিকেলের দিকে মায়ের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম। সম্ভবত এ সেই আশ্চর্য ইনজেকশনের গুণ। রাত্রে মায়ের জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছি এমন সময়ে মা বললেন, "কে জানে উনি হয়তো একজন মস্ত বড়ো ডাক্তার।"

জ্বরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এলো। আনন্দের আতিশয্যে দৌড়ে গ্রামের হোটেলওয়ালার স্ত্রীর কাছ থেকে বারোটা ডিম কিনে আনলাম। কয়েকটা নরম সেদ্ধ করে মাকে খেতে দিলাম। মা তিনটে ডিম আর আধ বাটি ভাতের ক্বাথ খেয়ে ফেললেন। পরদিন সেই ডাক্তার আবার তাঁর জমকালো পোশাক পরে উপস্থিত হলেন। তাঁর ইনজেকশনের গুণের কথা শুনে গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়লেন। ভাবখানা, ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম। তারপর মাকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখে আমার দিকে ফিরে বললেন "তোমার মা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর যা ইচ্ছে করে খেতে দাও, যা খুশি করতে দাও।"

এমন মজা করে কথা বলেন ভদ্রলোক যে হাসি চেপে রাখা দায়। দোর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে দেখি মা দিব্যি বিছানার ওপর বসে আছেন।

অন্যমনস্কভাবে নিজের মনেই বলে উঠলেন, "ভদ্রলোক সত্যিই বিচক্ষণ ডাক্তার বটে। আমার আর একটুও অসুখ নেই।" মুখের ওপর ভারি একটা খুশির ভাব ছেয়ে আছে।

"মা জানলার শার্সিগুলো খুলে দিই?" বাইরে বরফ পড়ছে। ফুলের পাপড়ির মতো বড়ো বড়ো তুষার আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। জানলা খুলে দিয়ে মায়ের পাশে বসে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

আবার যেন আপন মনেই বললেন, "আর আমার কোনো অসুখ নেই। যখন তোমার পাশে এভাবে বসি, তখন মনে হয় এতোদিন যা ঘটে গেছে, তা সব যেন স্বপ্ন। সত্যি বলছি বাড়ি-বদলের কথা ভাবতেও আমার অসহ্য মনে হয়েছিল।

আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়িতে আর-একটা দিন, এমন কি আর-এক বেলাও বেশি থাকতে পেলে আমি বর্তে যেতাম। ট্রেনে উঠে অবধি আমার আধমরা অবস্থা। এখানে প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত ভালো লাগার পরেই বিশেষ যখন অন্ধকার হয়ে এলো তখন টোকিওর জন্য মনটা হু হু করে উঠলো। সাধারণ কোন রোগ আমার হয়নি। ঈশ্বর যেন আগের আমিকে মেরে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন করে প্রাণ দিলেন।

সেদিন থেকে আজ অবধি আমরা এই নিরালা পাহাড়ের গায়ে ছোটো কুঁড়েতে দিন কাটাচ্ছি। আমরা রান্না করি, বারান্দায় বসে উল বুনি, চীনা ঘরে বসে বই পড়ি, চা খাই—এক কথায় বলতে গেলে, বিশ্ব-সংসারের বাইরে একান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করি। ফেব্রুয়ারি মাসে সারা গ্রামখানি বদরি ফুলে ছেয়ে গেলো। মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাতাসহীন শান্ত দিন একটির পর একটি পার হলো। মাসের শেষ পর্যন্ত ফুলেরা গাছের ডাল আলো করে রইলো। দিনের যে কোনো সময়ে বাইরে তাকালে ফুলেদের দম বন্ধ করা সৌন্দর্য চোখে পড়বেই। কাচের দরজাগুলো খুলে দিলেই মিষ্টি গন্ধে সারা বাড়ি ভুরভুর করে ওঠে।

মার্চের শেষে প্রতি সন্ধ্যায় একটা বাতাস কোথা থেকে আচমকা ছুটে আসে। মা আর আমি গোধূলি বেলায় চা খেতে বসলে পাপড়ির দল জানলার ভেতর দিয়ে উড়ে এসে আমাদের চায়ের পেয়ালায় পড়ে। এখন এপ্রিল মাস, গাড়ি-বারান্দায় উল বুনতে বসে জমি চাষের কি ব্যবস্থা হবে না হবে, সেই সব আলোচনা

করি। মা আমায় সাহায্য করতে চান। এখন লিখতে বসে মা ঠিক যেভাবে কথা কটি বলেছিলেন, সেটা মনে পড়ে গেলো—'আমরা মরে গিয়ে যেন আবার ভিন্ন মানুষ হয়ে বেঁচে উঠেছি। কিন্তু আমার ধারণা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে যিশুর মতো পুনর্জন্ম লাভ করা সম্ভব নয়। মা বলেছিলেন অতীতকে তিনি ভুলে গেছেন, অথচ আজই সকালে স্যুপ খেতে বসে নাওজির কথা মনে করে অমন শব্দ করে উঠেছিলেন। আমার মন থেকেও তো অতীতের ক্ষত মিলিয়ে যায়নি।

উঃ, আমি আজ সোজাসুজি মনের কথা উজাড় করে সমস্ত লিখতে চাই। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় এই বাড়িতে যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি, তা মিথ্যা, তা ভান। যদি ধরেও নিই যে মা ও আমার বিশ্রামের এই স্বল্প অবকাশটুকু ভগবানই দিচ্ছেন, তবু আসন্ন বিপদের কালো ছায়া যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, সে চিন্তার হাতও যে এড়াতে পারি না। মা খুশির ভান করেন, কিন্তু দিন-দিনই শুকিয়ে যাচ্ছেন। আর আমার বুকের ভেতর যে কালো সাপ বাসা বেঁধেছে, মায়ের আয়ু নিয়ে সেটা দিনে দিনে বেড়ে উঠছে, আমার সমস্ত প্রতিকূল চেষ্টা ব্যর্থ করে সে পরিপুষ্ট হচ্ছে। যদি এটা ঋতুর ফসল হতো! অতগুলো সাপের ডিম পোড়ানোর মতো ঘৃণ্য কাজ যে আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে, এর থেকেই আমার মানসিক অবস্থাটা অনুমান করে নেওয়া শক্ত নয়। আমার প্রতিটি কাজ মায়ের দুঃখ বাড়াবার ও শক্তিক্ষয় করার পক্ষে যথেষ্ট।

ভালোবাসা ··একবার কলম দিয়ে যখন শব্দটা বেরিয়ে গেছে, তারপর আর এগুনো চলে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় | আগুন

সাপের ডিমের ব্যাপারের পর, দিন দশেকের মধ্যে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে লাগলো যার ফলে মায়ের উদ্বেগ আর আয়ুক্ষয় সমান তালে এগিয়ে চললো।

আমি এক অগ্নিকাণ্ড বাধালাম।

বাড়িতে আগুন লাগানোর মতো এমন অপকর্ম যে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পারে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিলো। আশেপাশে পাঁচজনের জীবন বিপন্ন করে, নিজেই আইনের চোখে কঠিন সাজার পাত্রী হয়ে বসলাম।

ছেলেবেলা থেকে এমন একটি "কচি খুকুর" মতো মানুষ হয়েছিলাম যে অসাবধানতা থেকে যে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে এ ধারণাই আমার ছিলো না। একদিন গভীর রাতে হাত ধুতে উঠে বসার ঘরের পরদা ঠেলে এগুতে গিয়ে স্নানের ঘর থেকে একটা আলো চোখে পড়লো। বিশেষ কিছু খেয়াল না করেই সেদিকে চেয়েছিলাম, হঠাৎই আবিষ্কার করলাম স্নানের ঘরের দরজার কাঁচ লাল হয়ে গেছে, কাঁচ ফাটার শব্দও কানে এলো। পাশের দরজা দিয়ে খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে গেলাম। এতক্ষণে চোখে পড়লো যে চুলোর পাশে স্তূপীকৃত জ্বালানি কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বাগানের প্রান্তে জোতদারের বাড়ি। সে বাড়ির দরজায় প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিয়ে চেঁচাতে লাগলাম, "মিস্টার নাকাই, আগুন, আগুন! দয়া করে উঠে আসুন! বাড়িতে আগুন লেগেছে!"

মিস্টার নাকাই সম্ভবত শুয়ে পড়েছিলেন, তবু ভেতর থেকে জবাব দিলেন, "এখখুনি আসছি।" আমি তাঁকে আবার তাগাদা

দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ভদ্রলোক রাতের পোশাকেই নেমে এলেন।

আমরা দৌড়ে আগুনের কাছে পৌঁছলাম। পুকুর থেকে সবে দুজনে বালতি ভরে জল তুলতে শুরু করেছি, এমন সময় মায়ের ঘরের লাগোয়া বারান্দাটা থেকে তাঁর ডাক কানে এলো। জলের বালতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে বারান্দায় উঠেই মাকে জড়িয়ে ধরলাম নইলে তখখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।" "কিছু ভেবো না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষ্মীটি শুয়ে থাকো তুমি।" এক রকম জোর করেই তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আগুনের দিকে ছুটলাম। এবার আমি স্নানের ঘর থেকে বালতি ভরে জল মিস্টার নাকাইকে এগিয়ে দিলাম, উনি জ্বলন্ত কাঠের বোঝায় ঢালতে লাগলেন। কিন্তু আগুনের তেজ এতো বেশি যে ঐ ভাবে নেবানো যেতো না।

নীচে, "আগুন, বাড়িতে আগুন লেগেছে"—রব উঠলো। হঠাৎ চার-পাঁচ জন চাষী বেড়া ভেঙে আমাদের কাছে ছুটে এলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতে হাতে বালতি চালিয়ে ওরা আগুন নেবালো। আর একটু দেরি হলেই ছাতেও আগুন ধরে যেতো।

মনে-মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু পর-মুহূর্তেই এই অগ্নিকাণ্ডের কারণটি খুঁজতে গিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এতক্ষণে মনে পড়ল গত রাত্রে চুলো ঝেড়ে আধপোড়া কাঠগুলো নিবে গেছে ভেবে কাঠের গাদার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম। এই কথা মনে হতেই আমার চোখ ফেটে জল এলো। কাঠ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে শুনলাম সামনের বাড়ির মেয়েটি চেঁচিয়ে বলছে,—"কেউ নিশ্চয়ই উনুন সম্বন্ধে অসাবধান হয়েছে; জায়গাটা একেবারে পুড়ে খাক হয়ে গেছে।"

গ্রামের মেয়র, পুলিস, দমকল বিভাগের বড়ো কর্তা সবাই

এসেছেন। স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে মেয়র জিগগেস করলেন, "খুব ভয় পেয়েছো তো? কেমন করে হলো?"

"আমারই দোষ। ভেবেছিলাম কাঠগুলো বুঝি একেবারে নিবে গেছে।" এর বেশি কিছু বলতে পারলাম না। চোখে জল ভরে এসেছে, চোখ নিচু করে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো পুলিস আমায় এই দণ্ডে হাতকড়া পরিয়ে আসামীদের মতো টেনে নিয়ে যেতে পারে, এই সঙ্গে আমার আলুথালু বেশবাস সম্পর্কে হঠাৎ খেয়াল হলো—আমার পায়ে জুতো নেই, রাত-কামিজ পরে এতোগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

মেয়র সহানুভূতির সুরে বললেন, "বুঝেছি। তোমার মা ভালো আছেন তো?"

"মা তাঁর ঘরে বিশ্রাম করছেন। তাঁর পক্ষে ধাক্কাটা বেশিই হলো।"

কমবয়েসি পুলিসটিও সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো,—"যাক গে, বাড়িটায় যে আগুন ধরেনি এ ও বাঁচোয়া।"

ইতিমধ্যে মিস্টার নাকাই পোশাক বদলে এসে প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, "ব্যাপার কি? এতো হৈ চৈ কিসের? খানিকটা কাঠ পুড়ে গেলো, একে তো আর আগুন লাগা বলে না।" বেচারা ভদ্রলোক আমার বেফাঁস কথা চাপা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বোঝা গেলো।

মেয়র মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন, "বটেই তো। তারপর পুলিসকে কয়েক মিনিট কি সব বুঝিয়ে আমায় বললেন, "এবার আমরা আসি। তোমার মাকে আমার নমস্কার জানিও।" সবাই এগিয়ে গেলো, কেবল ঐ পুলিসটি আমার কানের কাছে এসে ফিশফিশ করে জানিয়ে গেলো, "আজকের ঘটনার কোনো রিপোর্ট করা হবে না।"

সে চলে যাবার পর মিস্টার নাকাই থমথমে গলায় জিগগেস করলেন, "পুলিসটা কি বলে গেলো?" আমি উত্তর দিলাম, "ও বললো যে এর কোনো রিপোর্ট হবে না।" প্রতিবেশী যারা এতক্ষণ ভিড় করে ছিলো তারাও সম্ভবত আমার জবাব শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যে-যার বাড়ি চলে গেলো। মিস্টার নাকাইও আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর ভস্মীভূত কাঠের স্তূপের পাশে একা শূন্য মনে দাঁড়িয়ে রইলাম। জলভরা চোখে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে।

আমি হাত মুখ ধুতে গেলাম। মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় পাচ্ছিলাম, স্নানের ঘরে চুল বেঁধে খানিকটা সময় নষ্ট করলাম। তারপর রান্না ঘরে ঢুকে অহেতুক বাসন-পত্র গুছিয়ে নিতে আরও কিছুটা সময় গেলো, ভোরের আলো ফুটে উঠলো।

তারপর পা টিপে টিপে মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি এরই মধ্যে জামা-কাপড় বদলে পরিপাটি হয়ে আরাম কেদারায় গিয়ে বসেছেন, মুখে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। আমায় দেখে হাসলেন বটে, কিন্তু সে মুখ কাগজের মতো শাদা।

প্রত্যুত্তরে আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। চুপ করে তাঁর চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালাম। খানিক পরে মা বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি—না? জ্বালানি কাঠগুলো তো জ্বলবার জন্যই ছিলো।"

আমার সারা মন জুড়িয়ে গেলো। ছেলেবেলায় রবিবারের স্কুলে শেখা বাইবেলের একটা লাইন মনে পড়ে গেলো, "ঠিক মতো কথা বলতে জানা, সময়োপযোগী একটি বাণীর মূল্য রূপোর ছবিতে সোনালি আপেলের মতো।" আমি এমন স্নেহময়ী মা পেয়েছিলাম। এই কথা মনে হতেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম।

জলখাবারের পাট সেরে পোড়া কাঠ সাফ করার কাজে হাত দিলাম। গ্রামের সেই হোটেলের বুড়ি ওসাকি বাগানের দরজা ঠেলে লাফাতে-লাফাতে এলো। "কি হয়েছিল? আমি এই মাত্র খবর পেলাম। গত রাত্রে কি ব্যাপার হয়েছিল?" বলতে বলতে ওর চোখে জল ভরে এলো।

অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে আমি উত্তর দিলাম, "আমি অত্যন্ত লজ্জিত।"

"লজ্জা পাবার কি আছে? কিন্তু পুলিস কি বললো?"

"ওরা বললো, সব ঠিক আছে।"

"আঃ বাঁচলাম!" খুশিতে ওর চোখ-মুখ ভরে ওঠে।

কি করে পাড়া-পড়শিকে ধন্যবাদ জানানো যায় আর আমার অপকর্মের জন্য মাপ চাওয়া যায়, ওসাকির সঙ্গে সেই পরামর্শ করলাম। সে বুদ্ধি দিলো যে, টাকা দিয়ে মেটালেই সবচেয়ে ভালো হয়। কয়েকটা বাড়ির নাম করে বললো, আমি যেন সেই সব বাড়িতে টাকা নিয়ে গিয়ে মাপ চেয়ে আসি। সে আরো বললো, "তোমার যদি একা-একা ঘুরতে খারাপ লাগে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।"

"বোধহয়, আমার একা যাওয়াই উচিত হবে, কি বলো?"

"একা পারবে? পারলে সত্যিই খুব ভালো হয়।

"আমি একাই যাবো।"

পোড়া কাঠের জঞ্জাল সাফ করে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একশো ইয়েনের কয়েকটা ছোটো ছোটো তোড়া করলাম। তোড়ার গায়ে লিখলাম "ত্রুটি মার্জনীয়।"

প্রথমেই গ্রামের দফতরে গিয়ে মেয়রের খোঁজ নিলাম। তিনি তখন বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন, যে মেয়েটি সব দেখাশোনা করে তার ডেস্কের কাছে গিয়ে বললাম, "আমার গত রাত্রের অপরাধ

ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু এর পর থেকে আমি খুব সাবধান হবো। অনুগ্রহ করে আমায় মার্জনা করবেন এবং মেয়রকে আমার অনুতপ্ত অন্তরের সংবাদ দেবেন।"

এবারে গেলাম দমকল বিভাগের বড় কর্তার বাড়ি। ভদ্রলোক নিজেই দোর-গোড়ায় এগিয়ে এলেন। আমাকে দেখে ম্লান হাসি হাসলেন, কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বললেন না। কি জানি কেন আমি কেঁদে ফেললাম, "অনুগ্রহ করে আমার গতরাত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন।" তাঁর কাছ থেকে কোনোমতে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেবে দৌড় দিলাম—আমার গাল বেয়ে অঝোরে কান্না ঝরে পড়ছিল। মুখ-চোখের এমন বিচ্ছিরি অবস্থা হলো যে, বাড়ি গিয়ে ফিরে প্রসাধন করতে হলো। আবার বেরোতে যাবো এমন সময়ে মা এসে দাঁড়ালেন, "এখনও শেষ হলো না? এবার কার বাড়ি যাচ্ছো?"

মুখ না তুলেই জবাব দিলাম, "এই তো সবে শুরু।"

"তোমার পক্ষে এ এক শাস্তি!" মায়ের কণ্ঠস্বরে দরদ ঝরে পড়ছিলো। তাঁর ভালবাসার জোরে মনে বল পেলাম এবং পরবর্তী যাবতীয় সাক্ষাৎকার নির্বিঘ্নে চোখের জল না ফেলেই সাঙ্গ করলাম।

সর্বত্র সবাই আমায় সহানুভূতি দেখালো, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো। একমাত্র মিস্টার নিশিয়ামার তরুণী স্ত্রী—তরুণী বলছি বটে, আসলে তার বয়েস চল্লিশের কম নয়—আমায় খুব বকলেন, "ভবিষ্যতে সাবধানে চোলো। যদ্দুর জানি তোমরা বড়ো ঘরের মেয়ে কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি, যেন ছেলেপিলেদের বাড়ি-বাড়ি খেলা চলছে। তোমাদের যেমন আনাড়িপনা, তাতে এতোদিন যে আগুন লাগেনি, সেটাই আশ্চর্য। দয়া করে ভবিষ্যতে খুব সাবধানে থেকো। গতরাত্রে ঝোড়ো বাতাস দিলে সারা গাঁখানা পুড়ে খাক্ হতো।

নিশিয়ামা-গিন্নির তিরস্কারের মর্ম বুঝতে কষ্ট হলো না। তিনি

যা বললেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এতো রূঢ় কথার পরেও তাঁর প্রতি আমার মন এতোটুকুও বিরূপ হয়নি। জ্বালানি কাঠ জ্বলবে এ আর বিচিত্র কি? এই রকম পরিহাসের মধ্যে দিয়ে মা আমার অপরাধের বোঝা হাল্কা করতে চেষ্টা করলেও নিশিয়ামা গিন্নির কথাটাও না মেনে পারলাম না। বাস্তবিক হাওয়ার জোর থাকলে রাত্রে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যেতে পারতো। তাই যদি হতো তবে আমি আত্মহত্যা করলেও এর যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হতো না এবং আমার সঙ্গে যে শুধু মাকেও শেষ করতাম তাই নয়, স্বর্গত পিতৃদেবের নাম পর্যন্ত ডুবে যেতো। জানি আজ বংশমর্যাদার মূল্য আগের মতো নেই, এর ধ্বংস অবধারিত; তবু আমি চাই এই পতনেও তার মহিমা যেন অক্ষুন্ন থাক। অগ্নিকাণ্ড-সূত্রপাতের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে যদি মরিও, তাহলেও আমি শান্তি পাবো না।

পরদিন থেকে উঠে পড়ে মাঠের কাজে লেগে গেলাম। মাঝে-মাঝে মিস্টার নাকাই-এর মেয়ে আমায় সাহায্য করে। সে রাত্রের সেই লজ্জাকর ঘটনার পর থেকেই কেমন যেন ধারণা হলো আমার রক্তের রং গাঢ় হয়ে গেছে, আর দিনে দিনে আমার চেহারা গেঁয়ো মেয়ের মতো অমার্জিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো, বারান্দায় মায়ের পাশে বসে উল বোনার সময়ে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, কেমন যেন দম আটকে আসে, বরং মাঠে গিয়ে কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি কুপিয়ে নিলে নিজেকে বেশ সহজ মনে হয়।

লোকে বললে বলে কুলি-কামারির কাজ। আমার পক্ষে এ ধরনের কাজ এই কিন্তু প্রথম নয়। যুদ্ধের সময় আমাকেও যোগ দিতে বাধ্য করা হয় এবং সেখানে মুটেগিরি পর্যন্ত করতে হয়েছে। এই যে রবার সোল দেওয়া কাপড়ের জুতো পরে মাঠে কাজ করি এটাও যুদ্ধের সময় পাওয়া। জীবনে সেই প্রথম এ ধরনের জিনিস পায়ে দিলাম, আশ্চর্যের কথা এটা পরে যথেষ্ট আরাম পেলাম।

এই জুতো পায়ে বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে আমি পশু-পাখি যারা খালি পায়ে হেঁটে-চলে বেড়ায় তাদের মতো হাল্কা বোধ করলাম। যুদ্ধের এটিই আমার একমাত্র সুখস্মৃতি। উঃ যুদ্ধ কী বীভৎস ব্যাপার।

গত বছর কিছুই হয়নি
তার আগের বছর কিছুই হয়নি
এবং তারও আগের বছর কিছুই হয়নি।

যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই এই মজার কবিতাটি কাগজে বেরিয়েছিল। আসলে অনেক ঘটনাই ঘটেছিল, কিন্তু যখন সেসব কথা মনে করতে চেষ্টা করি, তখন মনে হয় যেন কিছুই ঘটেনি। যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করতে অথবা অন্য কারো স্মৃতিকথা শুনতে দেখলে আমার ভীষণ বিতৃষ্ণা লাগে। জানি বহু প্রাণ নষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু তবু বলবো সে-এক বীভৎস কাণ্ড আর সেকথা শুনতে আমার একঘেয়ে লাগে। বুঝতে পারি তোমরা বলবে এ অত্যন্ত একলসেঁড়ের মতো কথা। আমায় যখন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে কাপড়ের জুতো পরিয়ে কুলির মতো খাটিয়ে নিলো, শুধু তখনই যুদ্ধের বীভৎসতা ছাড়া এর অন্যান্য দিক আমার চোখে পড়েছিল। মুটে-মজুরের কাজকে অনেক সময়ে ঘৃণার চোখেই দেখেছি কিন্তু এর দৌলতে আমার তাকত বেড়ে গেলো এবং এখন মাঝে-মাঝে মনে হয় জীবিকা অর্জ্জনের যদি কোনদিন প্রয়োজন ঘটে, তবে আমার মুটে-গিরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

যুদ্ধ যখন অত্যন্ত সাংঘাতিক মোড় নিচ্ছে, সে সময়ে একদিন মিলিটারি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়িতে এসে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যোগ দান করার এক আদেশনামা দিলেন ; তাতে কোন কোনদিন আমায় কাজে যেতে হবে, তাও ঠিক করা ছিলো। আমি দেখলাম যে, তার পরের দিন থেকেই

একদিন অন্তর আমাকে তাচিকাওয়ার পেছনে পাহাড়ের ঘাঁটিতে হাজির হতে হবে। চেষ্টা করেও চোখের জল আটকাতে পারলাম না।

চোখের জলের ধারা নেমেছে, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে জিগগেস করলাম, "আমার জায়গায় আর কাউকে পাঠালে চলবে না?"

ভদ্রলোক অবিচলিত স্বরে বললেন, "ফৌজে আপনাকে প্রয়োজন, আপনাকেই যেতে হবে।"

পরদিন বৃষ্টি পড়ছিল। পাহাড়ের নীচে সবাই আমরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, এক অফিসার অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন। "জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন না করলে, আমাদের যাবতীয় পরিকল্পনাই বিপন্ন হবে এবং দ্বিতীয়বার ওকিনাওয়ার ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে। তোমাদের নির্দিষ্ট কাজ অবশ্যই তোমরা সম্পন্ন করবে। দ্বিতীয়ত তোমরা সবাই পরস্পরের ওপর নজর রাখবে। তোমাদের মধ্যে কোথায় যে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ খবর কেউ জানে না। এখন থেকে মিলিটারিদের মতো তোমাদেরও সামরিক ঘাঁটিগুলিতে কাজ করতে হবে আর তোমরা যা দেখবে তা কোনোমতেই বাইরে প্রকাশ করবে না এবং সেজন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করবে।"

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা প্রায় পাঁচশো নর-নারী পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে অবিরল বৃষ্টিধারায় ভিজতে লাগলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে সব ভিজে গেলেও তাঁর বক্তৃতা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনছিলাম। দলের মধ্যে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েরাও ছিল। বেচারিদের কচি কচি মুখ, শীতে সব কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। বৃষ্টির জল আমার কোটের ভেতর ঢুকে গায়ের জামা ভেদ করে শেষে অন্তর্বাস অবধি জবজবে করে ভিজিয়ে দিলো। সেদিন সারাটা দিন পিঠের ওপর মাটির ঝুড়ি বয়েই আমার কাটলো। পরের বার

একদল শ্রমিকের সঙ্গে ঘাঁটিতে দড়ি টেনে টেনে কাটালাম। এই কাজটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো।

পাহাড়ে কাজের সময় দু-তিনবার আমার মনে হয়েছে ইস্কুলের ছেলেরা আমার দিকে কেমন যেন বেয়াড়াভাবে চেয়ে-চেয়ে দেখে। একদিন মাটির ঝুড়ি কাঁধে করে চলেছি, এমন সময়ে দুটি ছেলে আমার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একজন আর-একজনকে ফিশফিশ করে বললো,—"তোমার কি মনে হয় এ মেয়েটি গুপ্তচর ?"

খুব আশ্চর্য হয়ে পাশের মেয়েটিকে জিগগেস করলাম, "ছেলেটি একথা কেন বললো ?"

সেও বেশ গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলো, "হয়তো তোমায় বিদেশিনীর মতো দেখতে, সেইজন্য।"

"তাই নাকি ? তুমিও কি আমায় গুপ্তচর ভাবো নাকি ?"

মৃদু হেসে সে এবার জবাব দিলো, "না।"

"অমি তো জাপানী।" বলে নিজের বোকা কথা শুনে নিজেই হেসে উঠলাম।

এক উজ্জ্বল সকালে ছেলেদের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ি টেনে-টেনে জড়ো করছিলাম, এমন সময়ে এক ছোকরা অফিসার ভুরু কুঁচকে আমার দিকে আঙুল নেড়ে আমায় ডাকলো, "এই শোনো, এদিক এসো।"

জোরে জোরে পা চালিয়ে পাইন বনের দিকে সে এগিয়ে চললো, আমি তার পেছন-পেছন গেলাম। এদিকে তো ভয়ে-আতঙ্কে আমার বুক টিপটিপ করছে। করাত কল থেকে চিরে আনা স্তূপাকার এক কাঠের গাদার কাছে এসে সে আমার দিকে ফিরলো। "রোজ এতো ভরি কাজ করতে নিশ্চয় তোমার খুব কষ্ট হয়। আজ শুধু এই চেরা কাঠ পাহারা দাও, কেমন ?" ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে সে হাসলো।

"তার মানে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো ?"

"এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, গোলমালও নেই, কাঠের গাদাটার ওপর একটা ঘুম দিয়ে নিতে পারো। যদি একা-একা খারাপ লাগে এ-বইখানা প'ড়ো।" এই বলে একখানা বই পকেট থেকে বের করে সসঙ্কোচে তক্তার ওপর ছুঁড়ে দিলো। "বইখানা এমন কিছু নয়, তবে ইচ্ছে হলে পড়তে পারো।"

বইটার নাম ছিলো "ট্রয়কা।" আমি হাতে তুলে নিলাম। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বাড়িতেও একজন আছে যে বই পড়তে খুব ভালোবাসে, কিন্তু সে এখন প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে।"

সে আমার কথা ভুল বুঝলো। "ও, তোমার স্বামী! দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে! ভয়ানক জায়গা।" সমবেদনায় মাথা নেড়ে বললো, "যাই হোক, আজ তুমি পাহারা দাও, পরে আমি নিজে গিয়ে তোমার বরাদ্দ খাবারের বাকসোটা নিয়ে আসবো। ততক্ষণ তুমি নির্ভাবনায় জিরিয়ে নাও।" এই কটা ক'থা বলে সে হনহন করে চলে গেলো।

কাঠের গাদার ওপর বসে-বসে বই পড়তে লাগলাম। আধখানা বই শেষ হয়েছে এমন সময়ে জুতোর মচমচ শব্দে বুঝলাম অফিসারটি আসছে, "তোমার খাবার এনেছি। এখানে একা-একা বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছে, না?" ঘাসের ওপর খাবারের বাকসোটা রেখে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে গেলো।

খাওয়া শেষ করে কাঠের স্তূপের ওপর উঠে লম্বা হলাম। বইটা শেষ হতে হতে ঘুম এসে গেলো। বেলা তিনটের সময় ঘুম ভাঙতেই মনে হলো, অফিসারটিকে আগে দেখেছি, কিন্তু কোথায় সেকথা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ওপর থেকে নেমে সবে চুলটা গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময়ে আবার সেই মচমচ শব্দ কানে এলো।

"আজ এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ, ইচ্ছে হলে এবার বাড়ি যেতে পারো।"

আমি দৌড়ে কাছে গিয়ে বইখানা বাড়িয়ে দিলাম। ধন্যবাদ দেবো ভাবলাম কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, তার চোখে চোখ পড়তে আমার কান্না উপচে পড়লো। তার চোখ দুটিও শুকনো রইলো না।

নিঃশব্দে ঐভাবে আমরা বিদায় নিলাম। এরপর আমার কাজের জায়গায় এই তরুণ অফিসারটিকে আর কখনও দেখিনি। সেই একটি মাত্র দিন আমি একটু ছুটি পেয়েছিলাম, তারপর থেকে আবার একদিন অন্তর তাচিকাওয়ায় গিয়ে নিজের ভাগের কঠিন পরিশ্রম সেরে আসতাম। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না। কিন্তু আসলে কঠিন পরিশ্রমে আমার শরীর আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হলো এবং আজ পর্যন্ত মাঠে-ময়দানে কায়িক শ্রম আমায় কাবু করতে পারে না।

যুদ্ধের কথা বলতে বা শুনতে আমার অসহ্য লাগে, খানিক আগে এই কথাই বলেছিলাম। এখন দেখছি আমার জীবনের "অমূল্য অভিজ্ঞতার" কথা সবই বলা হয়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতির মধ্যে এই ঘটনাটুকুই আমার বলতে যা ভালো লাগে, বাদ বাকি সবটা এই কবিতার কথা দিয়েই সারা যায়।

গত বছর কিছুই হয়নি
তার আগের বছর কিছুই হয়নি
এবং তার ও আগের বছর কিছুই হয়নি।

বললে বোকার মতো শোনাবে যে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা হলো একজোড়া কাপড়ের জুতো।

এই জুতোর কথায় প্রসঙ্গান্তরে চলে এলাম। তবু একথাও না বললে নয় যে যুদ্ধের এই অদ্ভুত স্মৃতিচিহ্নটি পদযুগলে ধারণ করে, প্রতিদিন খেত-খামারে পরিশ্রম করে মনের উদ্বেগ ও হৃদয়ের গভীর অশান্তি ভুলে থাকি বটে, কিন্তু মা আমার দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন।

সাপের ডিম।

আগুন।

মায়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভয়াবহ রকম খারাপ হয়ে চলেছে, এদিকে আমার মনে হয়,আমি যেন দিন-দিন চাষা ভুষো-মেয়েদের মতো গায়ে-গতরে হয়ে উঠেছি। মায়ের জীবনীশক্তি শোষণ করে আমি চলছি, এ ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছে।

জ্বালানি কাঠ তো জ্বলবার জন্যেই আছে, এ ধরনের ঠাট্টা করা ছাড়া এ পর্যন্ত আগুনের ব্যাপার নিয়ে মা আর একটি কথাও বলেননি। আমায় বকা তো দূরে থাক, করুণাই করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর মনে এ ধাক্কা আমার দশগুণ বেশি বেজেছে। আগুন লাগার পর থেকেই মা ঘুমের মধ্যে ককিয়ে ওঠেন, আর যেদিন বাতাসের জোর থাকে, সেদিন যতো রাতই হোক, বারবার বিছানা থেকে উঠে এসে সব ঠিক আছে কিনা দেখে যান। কোনো সময় তাঁকে সুস্থ দেখায় না। কোনো কোনোদিন মনে হয় যেন তাঁর হাঁটতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। খেতের কাজে মা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে বাধা দিলাম, আমার নিষেধ না শুনে কুয়ো থেকে বড়ো বালতির পাঁচ-ছয় বালতি জল এনে দিলেন। পরদিন তাঁর পিঠে এমন যন্ত্রণা হলো যে নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। সেদিনটা বিছানায় কাটালেন। এরপর থেকে মনে হলো কায়িক শ্রমের চিন্তা তিনি ছেড়ে দিলেন। মাঝে-মাঝে মাঠে এসে দেখে যান, আমি কি করছি।

আজ আমার কাজ দেখতে এসে হঠাৎ মা বললেন, "লোকে বলে যারা গ্রীষ্মের ফুল ভালোবাসে তাদের মৃত্যুও হয় গ্রীষ্মকালে জানি না কথাটা কতদূর সত্যি।" আমি বেগুনের চারায় জল দিচ্ছিলাম, কোনো উত্তর দিলাম না। সবে গরম পড়েছে। মৃদু কণ্ঠে মা আবার বললেন, "হিবিস্কাস আমার অত্যন্ত প্রিয় ফুল, আমাদের বাগানে একটাও দেখি না।"

ইচ্ছে করে তীব্র স্বরে জবাব দিলাম, "বাগানভরা তো করবী আছে।"

"ও ফুল আমার ভালো লাগে না। গ্রীষ্মের সব ফুলই প্রায় ভালো লাগে, কিন্তু করবীর রঙ যেন বড্ডো বেশি চোখে লাগে।"

"গোলাপ আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি কিন্তু সে ফুল বছর ভোরই ফোটে। কে জানে গোলাপ যাদের প্রিয়, তাদের হয়তো ফিরে-ফিরে চারবার মরতে হয়।"

দুজনেই হেসে উঠলাম।

হাসতে হাসতেই মা জিগগেস করলেন, "একটু বিশ্রাম করবে না?" তারপর বললেন, "আজই যে তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলে নিতে চাই।"

"কী কথা? তোমার মৃত্যুর খবর হলে শুনতে চাই না।"

মায়ের পেছন পেছন গিয়ে মটর ফুলের মাচার নীচে বসলাম। ফুল ফোটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বিকেলের রোদ পাতার ছাঁকনি দিয়ে মোলায়েম হয়ে এসে আমাদের কোলে পড়ে জামা-কাপড় সব সবুজ করে দিলো।

"অনেকদিন ধরে তোমায় একটা কথা বলি-বলি করছি, কেবল দুজনেরই মন কখন ভালো থাকবে তার অপেক্ষা করছিলাম। বুঝতেই পারছো চট করে এসব কথা বলা যায় না, কিন্তু আজ কেমন মনে হচ্ছে এখন হয়তো বলতে পারি। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে কথাটা শোনো। নাওজি বেঁচে আছে।"

আমার সারা শরীর যেন পাথর হয়ে গেলো।

'দিন পাঁচ-ছয় আগে তোমার ওয়াদা মামার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে ওর কোনো কর্মচারী দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফিরছে। সে তোমার মামার অফিসে দেখা করতে গিয়েছিল। হঠাৎ কথা-প্রসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে যে লোকটি নাওজির সঙ্গে একই ইউনিটে

কাজ করতো। নাওজি ভালোই আছে এবং শিগগিরই ফিরবে। একটা খুব অপ্রিয় খবর লোকটির কাছে পাওয়া গেছে। লোকটি বলছে নাওজি দারুণ আফিংখোর হয়েছে।”

“আবার?”

আমি তেতো খাওয়ার মতো মুখ বাঁকালাম। হাই স্কুলে থাকতেই নাওজি কোনো এক ঔপন্যাসিকের দেখাদেখি নেশা শুরু করে, শেষ পর্যন্ত ডাক্তারখানায় এতো বিরাট দেনা করে বসে যে মাকে দু-বছর ধরে শোধ করতে হয়।

“হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আবার নেশায় ধরেছে ওকে। কিন্তু সে লোকটি বলছে যে এখানে আসার আগেই নেশা তাকে ছাড়তে হবে, নইলে দেশে আসা তার বন্ধ। তোমার মামার চিঠিতে আরও আছে যে, ভালো হয়ে ফিরলেও তার যেরকম মনের অবস্থা তাতে এখুনি কোনো চাকরি হওয়া সম্ভব নয়। আজকের দিনে টোকিও শহরে সুস্থ মানুষও কাজ করতে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। এতো সব গণ্ডগোলের ভেতর তার মতো আধা পঙ্গু ছেলে, যে সবে নেশা কাটিয়ে উঠেছে, সে কি করে না করে কিছুই এখনও বোঝা যাচ্ছে না। যদি নাওজি ফিরে আসে তবে তাকে কোথাও যেতে না দিয়ে এই পাহাড়ি জায়গায় সামলে রাখাই ভালো। এই গেলো এক নম্বর। কাজুকো, তোমার মামার চিঠিতে আরও কথা আছে। তিনি লিখেছেন যে, আমাদের সব টাকা ফুরিয়েছে, এ ছাড়া খাজানা পত্তর ও গচ্ছিত অর্থের ওপর কর বসানোর ফলে উনি আগের মতো টাকা পাঠাতে পারবেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারণের মতো অর্থ, বিশেষত নাওজি ফিরে এলে আমাদের তিনজনের খরচ পাঠানো তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হবে। তাঁর প্রস্তাব হলো এই যে, তোমাকে যত শিগগির সম্ভব পাত্রস্থ করা, নয় কোনো বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেওয়া।”

"ঝিগিরি ?"

"না, তোমার মামা আমাদের এক দূর সম্পর্কের জমিদার আত্মীয়ের কথা লিখেছেন, তাঁর বাড়িতে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের দেখা শোনা করতে পারো। তাতে তোমার বোধহয় খুব মন খারাপ লাগবে না অথবা সঙ্কোচ হবে না।"

"ছুনিয়াতে আর কোনো কাজ নেই ?"

"তোমার মামার মতে আর কোনো কাজ তোমার পক্ষে সুবিধের হবে না।"

"কেন সুবিধের নয় ?"

ম্লান হেসে মা চুপ করে রইলেন।

আমি বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠলাম, "না, এ ধরনের কথা আমি ঢের শুনেছি।" বুঝতে পারছি এতো উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই এবং এর জন্য পরে আমায় অনুতাপ করতে হবে, তবু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। "একবার চোখ মেলে আমার পায়ের দিকে ছাখো, এই বিচ্ছিরি কাপড়ের জুতো জোড়ার দিকে তাকাও।" আমার ছুচোখ বেয়ে কান্না ঝরে পড়ছে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে সোজা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম; আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো, "আমার এরকম ব্যবহার কিছুতেই করা উচিত নয়, কিছুতেই নয়। কিন্তু যা বলতে চাই তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথা যেন আমার অবচেতন অন্তস্তল ভেদ করে বেরিয়ে এলো।

"তুমিই না একদিন বলেছিলে যে আমার জন্য, শুধু আমার জন্যেই তুমি ইজুতে এসেছো ? তুমি বলেছিলে আমি না থাকলে তুমি মরে যেতে ? শুধু সেইজন্য আমিও তোমার পাশ ছেড়ে এক পা-ও নড়িনি। আর আজ আমার পায়ে কাপড়ের জুতো, কারণ তুমি যেসব তারকারি খেতে ভালোবাসো, আমি কেবল সেই সব সবজি

ফল্যাবার কথাই চিন্তা করছি। আজ যেই শুনলে তোমার নাওজি ফিরে আসছে, অমনি আমি তোমাদের সুখের পথে কাঁটা হয়ে গেলাম। অনায়াসে হুকুম করলে “যাও ঝিগিরি করো গে। অসহ্য! অসহ্য!”

নিজের কানেই কথাগুলো যারপরনাই কটু শোনালো, কিন্তু কোথায় যেন তারা বাসা বেঁধে ছিলো, নিজের অজান্তে বেরিয়ে গেলো, থামাতে পারলাম না।

“অবস্থা যখন পড়ে গেছে, টাকা ফুরিয়েছে, তখন দামী-দামী পোশাকগুলো বেচে দিলেই তো হয়। বাড়িটাই বা বেচে দি না কেন? আমি তো যাহোক কিছু করতে পারি। গাঁয়ের অফিসে কাজ নিতে পারি, সেখানে ওরা না নিলে মুটেগিরি করতে পারি। অভাবটা কিছুই নয়। যতক্ষণ তোমার স্নেহ-ভালোবাসা পাচ্ছি, ততক্ষণ তোমার পাশে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই তো আমার ইচ্ছে। কিন্তু তোমার যতো স্নেহ নাওজির জন্য জমা হয়ে আছে—তাই না? আমি যাবো, আমিই যাবো। নাওজির সঙ্গে আমার কোনোদিনও বনে না, মাঝে থেকে একসঙ্গে থাকার ফলে আমাদের তিনজনের জীবনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। বহুকাল তোমার সঙ্গে আছি, আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে কেনো খাদ নেই। এখন তুমি আর নাওজি, শুধু তোমরা দুজনেই থাকো। আশা করি তোমার জন্য অন্তত সে বুঝে-শুনে চলবে। আমার আর সহ্য হয় না, এ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। আমি চলে যাবো। আজই এক্ষুনি। আমার যাবার জায়গা আছে।”

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

“কাজুকো!” কঠোর স্বরে মা ডাকলেন। তাঁর চেহারায় এতোখানি ব্যক্তিত্ব এর আগে কখনও দেখিনি। মুখোমুখি উঠে দাঁড়াতে মাকে যেন আমার চেয়ে লম্বা দেখালো।

ক্ষমা চাইবার ইচ্ছেয় বুক ফাটতে লাগলো, কিন্তু মুখ ফুটলো না। বরং উল্টে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা উচ্চারণ করলাম। "তুমি আমায় ঠকিয়েছো মা, তুমি আমায় ঠকিয়েছো। ন্যাওজি যতোদিন আসেনি ততোদিন আমাকে তোমার প্রয়োজন ছিলো। আমি তোমার বাঁদী হয়ে ছিলাম। এখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আমায় দূর করে দিচ্ছো।"

আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

"তুমি অত্যন্ত বোকা," রাগে-উত্তেজনায় মায়ের স্বর কেঁপে উঠলো।

আমি মুখ তুলে চাইলাম। "হ্যাঁ, আমি বোকাই। আর সেই জন্যই সবাই তার সুযোগ নেয়। আমি বোকা বলেই তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছো। আমার চলে যাওয়াই মঙ্গল তাই না? অভাব কাকে বলে? টাকা-পয়সা? সেটাই বা কি? ওসব আমি বুঝি না। ভালোবাসাই আমার একমাত্র ভরসা, অন্তত মায়ের ভালোবাসা, সেইটুকুই আমার জোর।"

আবার আমি এমন বোকার মতো কথা বললাম, যা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

মা হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখে জল। ইচ্ছে হলো দৌড়ে গিয়ে পা জড়িয়ে ক্ষমা চাই, কিন্তু মাঠের কাজে হাত ময়লা ছিলো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপ্রস্তুত হয়ে দূরে সরে রইলাম।

"আমি এখান থেকে দূরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যাবোই। যাবার জায়গা আমার আছে।"

এই কথা বলবার পর কলঘরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই হাতমুখ ধুলাম। ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে আর-এক দফা কেঁদে নিলাম। সারা শরীরের যতো কান্না জমে আছে সবটুকু উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হলো। দোতলার বিদেশী-কেতার ঘরে ঢুকে

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কাঁদতে লাগলাম। তারপর আমার মন যেন যন্ত্রতন্ত্র চ'রে বেড়াতে লাগলো। ক্রমে গভীর দুঃখের মধ্যে বিশেষ একটি মানুষের জন্য আমার মন ব্যাকুল হলো—তার মুখখানা একবার দেখতে, তার গলার স্বর শুনতে আকুল হয়ে উঠলাম। ডাক্তার যখন কসটিক দিয়ে পায়ের তলা পোড়াবার ব্যবস্থা করেন, তখন যেমন পা এতোটুকু না কুঁচকে ব্যথা সইতে হয়, আমার কেমন যেন সেরকম আশ্চর্য অনুভূতি হলো।

সন্ধ্যেবেলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মা আলোটা জ্বাললেন। বিছানার কাছে এসে খুব মিষ্টি করে আমার নাম ধরে ডাকলেন।

আমি বিছানার ওপর উঠে বসে দুই হাতে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলাম। তারপর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম।

মা-ও মৃদু হেসে জানলার পাশে একটা সোফায় বসে পড়লেন। "জীবনে এই প্রথম তোমার মামার কথার অন্যথা করলাম। তাঁর চিঠির উত্তরে লিখে দিলাম, আমার ছেলে-মেয়েদের ভাবনা তিনি যেন আমার ওপরই ছেড়ে দেন। কাজুকো, আমরা সব দামি পোশাক বেচে ফেলবো। একটা-একটা করে ভালো জামা-কাপড় বিক্রী করে আমাদের খুশিমতো খরচ করবো। বেহিসেবি খরচ করবো আমরা। তোমায় আর মাঠে কাজ করতে দেবো না। রোজ রোজ তোমাকে চাষার মতো খাটতে হবে না। যতো মাগগিই হোক্ আমাদের সবজি আমরা বাজার থেকে কিনবো। প্রত্যেকদিন তোমার চাষার মতো খাটার কোনো মানে হয় না।"

সত্যি বলতে কি প্রতিদিন মাঠে খেটে-খেটে ইদানীং আমার শরীর খারাপ হয়ে আসছিলো। আমার বিশ্বাস এই জন্যেই আমি এতো সামান্য কারণে অমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বসলাম। তখন আমার মাথার ঠিক ছিলো না। তার ওপর শারীরিক ক্লান্তি আর

ছোটো মাছেদের বাসা, তারা আমার পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। কাকচক্ষু জলের তলে আমার পা দুটোর ছায়া ফেলে-ফেলে সাঁতরে বেড়ালাম। মায়ের আর আমার বর্তমান আলোচনার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, কিন্তু হঠাৎই কেমন ছবির মতো সবটুকু মনের মধ্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেলো।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে মায়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললাম, "মাগো আমায় ক্ষমা করো।" এতক্ষণে কথাটা বলতে পারলাম।

আজ মনে পড়ে সেদিন পর্যন্ত আমাদের আনন্দের শেষ শিখাটুকু নিবে যায়নি। নাওজি দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফেরার পরই শুরু হলো আমাদের নরকবাস।

তৃতীয় অধ্যায় চন্দ্রমল্লিকা

এমন একটা অসহায় ভাব, মনে হয় যেন আর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড ঝড়ের পর শাদা মেঘের দল যেভাবে আকাশের গায়ে এলোমেলো ছুটে বেড়ায়, তেমনি আমার বুকের ভেতর যন্ত্রণার তরঙ্গ উথাল-পাথাল করে ফেরে। একটা মারাত্মক অনুভূতি—তাকে আতঙ্ক বলবো কিনা জানি না—আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে দিচ্ছে, নাড়ি চঞ্চল করে তুলছে, দম বন্ধ করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি, মনে হয় আমার সারা দেহের শক্তি যেন আঙুলের ডগা দিয়ে নিঃশেষে ঝরে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বিচ্ছিরি একঘেয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যা করি, তাতেই মন খারাপ হয়ে যায়। আজ আবার বেতের চেয়ারখানা বারান্দায় টেনে নিয়ে বসলাম—ইচ্ছে, গত বসন্তে শুরু করা সোয়েটারখানা এবার শেষ করবো। হালকা গোলাপি রঙের সঙ্গে গাঢ় নীল উল মিলিয়ে জামা বুনছি। বছর কুড়ি আগে, আমি তখনও প্রাথমিক ইস্কুলের ছাত্রী, সে সময়ে মা আমায় একখানা স্কার্ফ বুনে দিয়েছিলেন। গোলাপি পশমটা দিয়ে সেই স্কার্ফের শেষের দিকে ছোটো টুপির মতো করে বুনেছিলেন। সেটা পরে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে নিজেকে মনে হতো খুদে শয়তান। আমার ইস্কুলের বন্ধুরা যে সব স্কার্ফ গায়ে দিতো, আমারটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের বলে ওটা আমার দু-চোখের বিষ ছিলো। ঐ স্কার্ফ গায়ে দিয়ে কারুর সামনে বেরুতে এতো লজ্জা হতো যে বহুদিন ব্যবহার না করে দেরাজে ফেলে রেখেছিলাম। সেই থেকে সেটা সেখানেই পড়ে ছিলো। সম্প্রতি বসন্তকাল পড়তে হঠাৎই ওটা বের করে উলগুলো খুলে গোটাতে বসলাম। নষ্ট-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সদিচ্ছা নিয়ে ঐ

পশম দিয়েই নিজের জন্য একখানা সোয়েটার বুনবো ঠিক করলাম। কি জানি কেন ঐ ফিকে রঙটা আমার অপছন্দ হওয়ায় আবার উলটা বাকসো বন্দী হলো। আজ অন্য কাজের অভাবে মুহূর্তের খেয়ালে উলটা বের করে শিথিল হাতে বুনতে বসলাম। বুনতে শুরু করে খেয়াল হলো, মেঘাচ্ছন্ন ধূসর আকাশের সঙ্গে এ উলের হালকা গোলাপি রঙ এতো চমৎকার খুলেছে যে, রঙের এমন অপূর্ব, স্নিগ্ধ সামঞ্জস্য ভাষায় বোঝানো শক্ত। আকাশের রঙের সঙ্গে পোশাকের রঙের শোভন সঙ্গতি থাকা যে এতোটা প্রয়োজন, সে ধারণাই আমার ছিলো না। অবাক হয়ে ভাবলাম, রঙ মেলাতে পারলে কী অপরূপই না হতে পারে! আকাশের ধূসরের সঙ্গে পশমের ফিকে গোলাপি··· দুটি রঙই খুলে যায়। আমার হাতের ঐ উল যেন প্রাণস্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আর ঠাণ্ডা মেঘলা আকাশ যেন মখমলের মতো কোমল হয়ে এলো। মানের একখানা ছবির কথা মনে পড়লো, "কুয়াশার মধ্যে একটি গির্জ্জা"—জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করলাম সুরুচি কাকে বলে; মনে মনে উলটাকে ধন্যবাদ দিলাম। সুরুচি। শীতের বরফঢাকা আকাশের নীচে ঐ রঙ যে কত সুন্দর দেখাতে পারে বুঝেছিলেন বলেই মা ফিকে গোলাপি রঙ পছন্দ করেছিলেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি তখন সেকথা বুঝিনি। চিরদিনই নিজের খুশিমতো চলেছি; মা কোনো বাধা দেবার চেষ্টাও করেননি, এতোকাল ধরে আমায় কখনও বোঝাতে চাননি, শুধু অপেক্ষা করেছিলেন কবে নিজে থেকে আমার চোখ খুলবে। ভাবলাম, আমার মায়ের মতো এমন মা আর কোথায়? ঠিক সেই মুহূর্তে আশঙ্কা আর আতঙ্কে আমার মন ভরে গেলো, হয়তো নাওজি আর আমি দুজনে মিলে মাকে অত্যাচার করে প্রায় শেষ করতে চলেছি। যতোই ভাবি ততোই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে আমাদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। এই দুশ্চিন্তা···এমন একটা অজানা আতঙ্কে আমার মন

জুড়ে রইলো যে, মনে হলো এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আঙুল-গুলি অসাড় হয়ে এলো, বোনার কাঁটা দুটো কোলের ওপর পড়ে গেলো। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো। চোখ বুজেই মাথা তুলে নিজের অজানতে চেঁচিয়ে উঠলাম, "মা-গো!"

ঘরের কোণে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে মা কি একটা বই পড়ছিলেন, অবাক হয়ে উত্তর দিলেন—"কি হলো?"

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেলো। অহেতুক উঁচু গলায় জবাব দিলাম, "জানো মা, গোলাপগুলো শেষ পর্যন্ত ফুটলো। আমি এইমাত্র লক্ষ্য করলাম। এতোদিনে তবে ফুটলো।"

বহুকাল আগে ফ্রান্স (না ইংল্যাণ্ড?)—এরকম অনেক দূর থেকে ওয়াদামামা এই গাছের চারা নিয়ে এসেছিলেন। আমরা নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ি থেকে তুলে এনে এ বাড়িতে পুঁতেছিলাম। একটা গোলাপ যে ফুটেছে সেটা আমি সকালেই লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু এখনকার অপ্রস্তুত ভাব কাটাবার জন্য বেশ একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বললাম, যেন আমি এইমাত্র দেখেছি। ঘোর বেগুনি রঙের এই ফুলগুলোতে একটা দম্ভ আর সজীবতা যেন ফুটে বেরোচ্ছে।

"হ্যাঁ আমি জানতাম," শান্তকণ্ঠে মা আবার বললেন,—"তোমার কাছে এসব জিনিসের মূল্যই আলাদা।"

"বোধহয়। আমার জন্য কি তোমার দুঃখ হয়?"

"না। আমি শুধু বলতে চাই যে তোমার স্বাভাবই হলো তাই। ঠিক যেমনটি তুমি রান্নাঘরে দেশলাই-বাকসের ওপর রেনোয়ার ছবি সাঁটো, কিংবা পুতুলের জন্য রুমাল সেলাই করো। বাগানে গোলাপের কথা তুমি এমনভাবে বললে, মনে হয় যেন জ্যান্ত মানুষের কথা বলছো।"

"আমার নিজের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই বলেই বোধহয়।"

বলে ফেলে অবাক হলাম—এ আমি কি বললাম? অপ্রস্তুত-

ভাবে কোলের ওপর বোনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। মনে হলো টেলিফোনে যেমন শোনায়, তেমনি হেঁড়ে গলায় একজন পুরুষমানুষ যেন বলছে, "এ আর আশ্চর্য কি? উনতিরিশ বছর বয়সটা তো হলো।" লজ্জায় আমার গাল দুটো জ্বালা করতে লাগলো।

কোনো মন্তব্য না করে মা আবার বইতে মন দিলেন। কিছুদিন ধরে মা মুখের ওপর একখানা পাতলা জালের ঢাকনা পরে থাকেন। সেইজন্যই বোধহয় কথাবার্তা আরও কমে গেছে। আসলে নাওজির কথায় মা ঐ ঢাকা পরতে আরম্ভ করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে নাওজি দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফিরেছে। আগে থেকে কোনো খবর না দিয়ে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দড়াম শব্দে কাঠের ফটকখানা বন্ধ করে দিয়ে নাওজি বাগানে ঢুকলো। "কী সাংঘাতিক! বাড়ি পছন্দের কী মারাত্মক নমুনা! একটা সাইনবোর্ড টাঙাও না কেন—"চীনা ভবন: চৌ মিয়েন!"

আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই এই সম্ভাষণ!

গত দু-তিনদিন যাবৎ জিভের একটা ব্যথায় মা শয্যাশায়ী। জিভের ডগায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না, কিন্তু মা বললেন নাড়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এ কয়দিন খুব পাতলা স্যূপ খাচ্ছিলেন। ডাক্তার ডাকার কথা বললে মা আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়লেন, জোর করে হেসে বললেন,— "ডাক্তার দেখে হাসবেন।" তুলি দিয়ে জিভে লুগোল বুলিয়ে দিলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। মায়ের অসুখে ঘাবড়ে গেলাম। ঠিক এই সময়ে নাওজি এলো।

মিনিট খানেক মায়ের বালিশের পাশে বসে মাথা নেড়ে কি একটা বলে সম্ভাষণ জানালো। ব্যাস্ ঐ পর্যন্ত। পর মুহূর্তে

লাফিয়ে উঠে বাড়িটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে গেলো। আমি ওর পেছন পেছন গেলাম।

"মাকে কেমন দেখলে? বদলে গেছেন, না—?"

"বদলেছেন বইকি, খুব রোগা হয়ে গেছেন। অনেক আগেই তাঁর মরে যাওয়া ভালো ছিলো। আজকের দুনিয়ায় মায়ের মতো লোকদের বেঁচে-থাকার কোনো অর্থ হয় না। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে আমার মতো হতভাগারও বুক ফেটে যায়।"

"আমায় কেমন দেখছো?"

"তোমার চেহারা রুক্ষ হয়ে গেছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে দু-তিনজন পুরুষ জুটেছে। এখানে ধেনো পাওয়া যায়? আজ রাতে যতো পারি গিলবো ঠিক করেছি।"

গাঁয়ের সরাইখানায় ঢুকে, ভাই বাড়ি ফিরেছে এই উপলক্ষে অল্প একটু ধেনো মদ চাইলাম, কিন্তু হোটেলওয়ালি বললে দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মাল ফুরিয়ে গেছে। নাওজিকে গিয়ে সেকথা বলতে রাগে ওর মুখ কালো হয়ে গেলো, এমন আমি ওকে আগে কখনও দেখিনি, এ যেন অচেনা মানুষ। "চুলোয় যাক। এদের কি করে পটাতে হয় তুমি জানো না।" হোটেলের ঠিকানা আমার কাছে জেনে নিয়ে সেদিকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। এই তো ব্যাপার! ঘণ্টার পর ঘণ্ট শুধু পথ চেয়ে বসে রইলাম, কিন্তু বৃথা। নাওজির প্রিয় খাবার, সেঁকা আপেল আর একটা ওমলেট্ রেঁধেছিলাম, খাবার ঘরটা একটু উজ্জ্বল দেখাবে ভেবে বেশি পাওয়ারের বাল্‌বও লাগিয়ে-ছিলাম। অপেক্ষা করে বসে আছি, এমন সময়ে হোটেলের মেয়ে ওসাকি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে ফিশফিশ করে এক জরুরি প্রশ্ন করলো, "মাপ করবেন। এটা কি উচিত হচ্ছে? উনি তো সেখানে গিয়ে জিন্ গিলছেন।" ওর ছানাবড়া চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

"জিন্? মানে মেথিল অ্যালকোহল?"

"না, মেথিল নয় ঠিক, তবে অনেকটা তাই।"

"খেলে ওর অসুখ করবে না তো?"

"তাহলে গিলুক গে।" "না, কিন্তু তবু···

মাথা নেড়ে ঢোঁক গিলে ওসাকি চলে গেলো।

মাকে জানালাম, "সে তো ওসাকির ওখানে গিয়ে মদ খাচ্ছে।" মার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠলো—"আফিং ছেড়েছে নিশ্চয়ই। খাবারের পাট চুকিয়ে এসো তাহলে। আজ আমরা তিনজনে এ ঘরেই শোবো। নাওজির বিছানাটা মাঝে পেতে দাও।"

আমার বুক ঠেলে কান্না এলো।

অনেক রাতে ধপধপ শব্দ করতে-করতে বাবু বাড়ি ফিরলেন। ঘরজোড়া মশারিটা ফেলা ছিলো, আমরা তিনজনেই ভেতরে ঢুকলাম।

শুয়ে শুয়ে বললাম—"তোমার দক্ষিণ সাগরের গল্প মাকে শোনাও না কেন?"

"বলার মতো কিছু নেই, একেবারে কিছুই না। মনেও পড়ে না সব। জাপানে ফিরে এসে ট্রেনের জানলা দিয়ে ধানখেত দেখতে ভারি ভালো লাগছিল। ব্যাস্। এবার আলোটা নেবাও, ঘুমোতে পারছি না।"

অগত্যা আলো নিবিয়ে দিলাম। গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না মশারি ভেদ করে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ছে।

পরদিন সকালে বিছানায় শুয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে নাওজি সিগ্রেট টানতে লাগলো। যেন এই প্রথম খেয়াল হলো যে, মা অসুস্থ এমনভাবে মাকে বললো, "শুনলাম তোমার জিভে কি একটা ব্যথা হয়েছে?"

মৃদু হেসে মা চুপ করে রইলেন।

"আমি ঠিক জানি এ তোমার মনের রোগ। খুব সম্ভব রাতে

তুমি হাঁ করে ঘুমোও। বড্ডো অসাবধান তুমি। মুখের ওপর পাতলা ওড়না পরে থেকো। রিভানলের জলে এক টুকরো গজ-কাপড় ডুবিয়ে ঢাকনার মধ্যে নিয়ে নিও।"

আমি সজোরে প্রতিবাদ করলাম, "এ তোমার কোন দেশি ডাক্তারি শুনি?"

"এর নাম রুচিসম্মত চিকিৎসা।"

আমি জানি মুখ ঢাকা পরতে মার খুব খারাপ লাগবে। মা মুখের ওপর কোনো জিনিস বরদাস্ত করতে পারেন না। চশমা পর্যন্ত না। চোখ ফুলে ব্যথা হলে চোখের ওপর কিছু বেঁধে রাখতেও মায়ের আপত্তি, মুখের ওপর ঢাকনা চাপানো তো দূরের কথা।

মাকে জিগগেস করলাম,—"মা তুমি পরবে?" সাগ্রহে মা জবাব দিলেন, "পরবো বৈকি।" আমি তো একেবারে থ। মনে হলো যেন নাওজির প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে, তার ইচ্ছা পালন করতে মা পণ করে বসে আছেন।

প্রাতরাশের পর নাওজির নির্দেশমতো রিভানলের জলে ভিজিয়ে খানিক গজ কাপড় মুখ চাপা দেওয়ার মতো ভাঁজ করে মার কাছে নিয়ে গেলাম। বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে ঢাকাটা নিয়ে কানের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলেন। তারপর অসহায়া বালিকার মতো শুয়ে রইলেন।

সেদিন বিকেলে টোকিওতে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করা দরকার, এই অজুহাতে মায়ের কাছ থেকে দু-হাজার ইয়েন নিয়ে নাওজি রওনা হলো।

তারপর দশদিন কেটে গেছে, কিন্তু তার ফেরার কোনো লক্ষণ নেই। প্রতিদিন মুখে ঢাকনা পরে মা নাওজির জন্য অপেক্ষা করেন। আমায় বলেন যে ওষুধটা নাকি কাজ দিয়েছে, ঢাকনা পরে বাস্তবিকই জিভের ব্যথা অনেকটা কম থাকে। আমার কিন্তু মনে

হয়, মা সত্যি কথা বলেন না। বিছানা থেকে উঠেছেন বটে, তবে খাওয়া দারুণ কমে গেছে। কচিৎ কখনো কথা বলেন। মায়ের জন্য আমার চিন্তার অবধি নেই, আর নাওজি যে কেন এতো দেরি করছে ভেবেই পাই না। নাওজি যে ঔপন্যাসিক উয়েহারার সঙ্গে হৈ হৈ করে টোকিও-র পাগল করা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়েছে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এসব কথা মনে এলে নিজের জীবন আরও দুর্বিষহ ঠেকে। গোলাপ ফুলের প্রসঙ্গ তুলে যখন অযথা উত্তেজিত হই বা নিজের সন্তানের অভাব স্বীকার করার মতো লজ্জাকর ঘটনাও যখন আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ধীরে ধীরে আমি নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমার বোনাটা পড়ে গেলো। নিজেকে নিয়ে কি করি ভেবে পেলাম না। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় বিদেশি-কেতার ঘরের দিকে উঠে গেলাম।

এ ঘরখানায় নাওজি থাকবে। চার-পাঁচ দিন আগে মা আর আমি এই ঠিক করে নাকাই-এর সাহায্যে ধরাধরি করে নাওজির আলমারি, বই, কাগজ, অসংখ্য অন্যান্য জিনিসে বোঝাই করা কাঠের বাকসো, আমাদের আগের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়িতে তার যা কিছু ছিলো—সব সে-ঘরে এনে ফেললাম। এই আলমারি, বইয়ের বাকসোগুলো কোথায় যে কিভাবে রাখতে চায় বুঝতে না পেরে, টোকিও থেকে ফিরলে গোছাবো ভেবে অপেক্ষা করে রইলাম। ঘরের অবস্থা যা দাঁড়ালো তাতে সেখানে নড়াচড়াই দুঃসাধ্য। একখানা খোলা কাঠের বাকসো থেকে অন্যমনস্কভাবে তার নোটবই-গুলো থেকে একখানা তুলে নিলাম। মলাটের গায়ে লেখা "চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা।" মনে হলো ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ থাকাকালীন লেখা ডায়েরি।

"অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণা ! আর এমন অসহনীয় যন্ত্রণা সত্ত্বেও "কষ্ট হচ্ছে" এ কথাটাও আমি উচ্চারণ করতে পারছি না। মানব-ইতিহাসে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অতলস্পর্শী এই নরক-যন্ত্রণাকে তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না।

দর্শন ? মিথ্যা। ধর্ম ? আদর্শ ? মিথ্যা। শৃঙ্খলা ? মিথ্যা। নিষ্ঠা ? শুচিতা ? মিথ্যা। লোকে বলে উশিজিমার মটর-ফুলের বয়েস হাজার বছর আর কুমানোর মটর ফুলের বয়েস শত শতাব্দী। শুনেছি উশিজিমার মটরলতা নয় ফিট এবং কুমানোর লতা পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ঐ গুচ্ছ-গুচ্ছ মটর ফুলের শোভায় আমার প্রাণ-মন নেচে ওঠে।

সেও তো কারও সন্তান। তারও প্রাণ আছে।

যুক্তি প্রকৃতপক্ষে যুক্তির প্রতি অনুরাগ। সে অনুরাগ জীবিত মানুষের জন্য নয়।

অর্থ ও নারী। যুক্তি সেখান থেকে পড়ি তো মরি করে পালায়।

ডাক্তার ফাউস্টের দুঃসাহসিক উক্তি : একটি কুমারীর হাসির কাছে ইতিহাস, দর্শন, শিক্ষা ধর্ম, আইন, রাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি জ্ঞানের সব শাখাই তুচ্ছ।

দম্ভের আরেক নাম পাণ্ডিত্য। এ শুধু মানুষকে মানুষ না হতে দেবার প্রচেষ্টা।

স্বয়ং গ্যেটের সামনেও আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা রয়েছে। নির্ভুল বাক্যবিন্যাস, পরিহাস-প্রবণতা, পাঠককে অভিভূত করার মতো করুণ রসের অবতারণা অথবা এমন ত্রুটিহীন, অসামান্য এক উপন্যাস, উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উদার কণ্ঠে যা পাঠ করা চলে (তাকে কি চলচ্চিত্রের ধারাবাহিক বিবরণী বলবো ?)—এমন কিছু লেখা আমার দ্বারা অসম্ভব নয়—যদি না লজ্জা এসে বাধা দেয়। আসলে প্রতিভা সম্বন্ধে এই আত্মসচেতনতা কেমন যেন হালকা বলে মনে হয়। একমাত্র পাগল লোকেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়ে উপন্যাস পড়ে। সেক্ষেত্রে শোকযাত্রীর মতো যথোপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে পড়লে সবচেয়ে ভালো হয়। দারুণ কিছু লেখার মতো কৃত্রিম না হলেই ভালো। আমার উপন্যাস হবে খাপছাড়া। ইচ্ছে করেই জঘন্য লেখা লিখবো, বন্ধুর মুখে ফুটে উঠবে অনাবিল আনন্দের হাসি—মাথা চুলকোতে-চুলকোতে দুর্ভাগ্যের চরমে পৌঁছে যাবো। আঃ, বন্ধুর খুশিতে ভরা মুখখানা দেখতে পাবো !

"জাপানের শ্রেষ্ঠ নির্বোধ এখানে উপস্থিত। আমার তুলনায় তোমরা সবাই বিচক্ষণ, তোমাদের মঙ্গল হোক !" কি জানি কি অনুরাগে আমি আমার বাক্সে

লেখা আর দুশ্চরিত্রের খেলার ভেঁপু বাজিয়ে বলে বেড়াতে পারবো যে—এই কথা :

"বন্ধুবর! পরিতৃপ্ত মুখে তুমি যখন বলো—ঐ তো ওর বদ্‌রোগ, কি দুঃখের কথা।" এ কথা তো জানো না যে তোমাকে ভালোবাসে সে।

জানি না, কে মন্দ নয়।

ক্লান্তিকর এই দুশ্চিন্তা।

টাকা চাই।

টাকা না পেলে·········

আমার ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু!

ডাক্তারখানায় হাজার ইয়েন ধার হয়ে গেছে। আজ এক বন্ধকী দোকানের কেরানিকে গোপনে বাড়িতে ঢুকিয়ে, আমার ঘরে এনে জিগগেস করলাম, "এখানে বন্ধক দেবার মতো দামি কিছু চোখে পড়ছে কি? যদি তেমন বোঝো তবে তুলে নিয়ে যাও। টাকার আমার বিশেষ দরকার।"

ঘরের ভেতর আলগোছে চোখ বুলিয়ে কেরানিটা বেহায়ার মতো বললে "এ মতলব ছেড়ে দিন বাবু, এ আসবাব তো আপনার নয়।"

আমিও খেপে উঠলাম, "ঠিক আছে। আমার নিজের হাত-খরচের টাকায় যা যা কিনেছি, তাই তবে নিয়ে যাও।" কিছু টুকিটাকি অজস্র জিনিস তার সামনে স্তূপ করে দিলাম—তার একটিরও কোন বন্ধকী দাম নেই।

জিনিসের তালিকা, প্লাস্টারের তৈরি একখানা হাত। ভেনাসের দক্ষিণ হাতখানা। স্ট্যাণ্ডের ওপর বসানো হাতটি যেন ঠিক ডালিয়া ফুলের মতো শুচিশুভ্র। চক্ররেখাবিহীন অঙ্গুলিপ্রান্ত, রেখাবিহীন করতল এই তুষারশুভ্র সুকোমল হাতখানি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে—যে নিদারুণ লজ্জায় ভেনাসের দম বন্ধ হয়ে আসে, তার অভিব্যক্তি দর্শকের হৃদয় করুণায় ভরে তোলে। এই ভঙ্গিতে ধরা পড়ে গেছে তার সেই মুহূর্তের অপরিসীম লজ্জা যখন তার পরিপূর্ণ নগ্নতা একজন পুরুষের সামনে উন্মোচিত হলো—নিজের নগ্নতার শরমে আর বেদনায় ত্রস্ত ভঙ্গি-পরিবর্তনের ছাপ যেন পরিস্ফুট। দুর্ভাগ্যবশত এটি ছিলো চীনে-মাটির তৈরি। কেরানিটি এর জন্য মাত্র পঞ্চাশ সেন দিতে রাজি হলো।

অন্যান্য জিনিসের তালিকা—প্যারীর শহরতলির একটা বিরাট মানচিত্র। প্রায় এক ফুট বেড়ের একটা সেলুলয়েডের লাট্টু। বিশেষ এক রকমের কলমের

নিব যা দিয়ে সুতোর চেয়েও মিহি লেখা যায়। দারুণ শস্তায় পাচ্ছি ভেবে এককালে এসব কিনে রেখেছিলাম।

কেরানিটি হেসে বললো, "এবার তবে আসি।"

"দাঁড়ান।" বলে জোর করে একরাশ বই এনে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাত্র পাঁচ ইয়েন উদ্ধার হলো। অল্প কয়েকখানা বাদে আমার তাকের সব কটা বই ছিলো কাগজে বাঁধাই শস্তা সংস্করণ, তাও আবার পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কেনা। এতো কম দাম পাওয়া যাবে, সে আর আশ্চর্য কি?

এক হাজার ইয়েন দেনা মেটাতে মোটে পাঁচ ইয়েন জোগাড় হলো। সর্ব-সাকল্যে আমার ট্যাঁকের জোর প্রায় এইরকমই দাঁড়ায়। হাসির কথা নয়।

যাঁরা আমার সমালোচনা করেন, তাদের কয়েকজন যখন মুরুব্বি চালে বলেন, "বেঁচে থাকতে হলে কি অধঃপাতে যেতে হবে," তখন মনে হয় এর চেয়ে শুধু যদি তাঁরা আমায় মরতে বলতেন সেটা অনেক ভালো হতো। সে অনেক সোজা হতো। কিন্তু মানুষ কখনও বলে না, "মরো।" অর্বাচীন পণ্ডিত-ভণ্ডের দল। ন্যায়-বিচার? তা তুমি তথাকথিত শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে সন্ধান পাবে না। মনুষ্যত্ব? বোকার মতো কোরো না। আমি জানি। তোমাদের সুখের জন্য আশেপাশের মানুষদের পিষে মারছো। এও তো খুন! "মরো!" এই রায় দেওয়া ছাড়া এ একেবারে অর্থহীন। প্রতারণা করে লাভ নেই।

আমাদের শ্রেণীর মধ্যেও ভালো লোক বলতে কেউ নেই। নির্বোধ, ভূত, প্রেত, কৃপণ, পাগলা কুকুর—সব হামবড়ার দল, কেবল বড়ো বড়ো কথা, মেঘের ওপর থেকে মূত্রত্যাগ করছে।

"মরো।" শুধু এই আশীর্বাদটুকু পেলে আমার অনেক পাওয়া হতো।

যুদ্ধ। জাপান যুদ্ধ করছে মরিয়া হয়ে।

এরকম মরিয়া অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে আমাকে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করাবে …ধন্যবাদ তার দরকার হবে না। আমি বরং নিজের হাতে মরবো।

মিথ্যে কথা বলার সময়ে মানুষ গম্ভীর হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান নেতারা আজকাল কিরকম রাশভারি। ছোঃ!

যারা গণ্যমান্য নয়, তাদের সঙ্গই আমার কাম্য। কিন্তু তারা তো আমার সঙ্গে মিশতে চায় না।

আমি যখন অকালপক্ক সেজেছি, তখন সবাই ধরে নিতো সত্যি আমি তাই। যখন অলসভাবে দিন কাটিয়েছি, তখন সবাই বললো নিষ্কর্মা। যখন তাদের বোঝালাম উপন্যাস লেখা আমার আয়ত্তের বাইরে, সবাই ধরে নিলো হয়তো তাই। মিথ্যে কথা বলতে শুরু করলাম, সবাই বললো, 'মিথ্যেবাদী। যখন মস্ত বড়োমানুষি চাল দেখালাম, লোকে বললো 'বড়োলোক'।' উদাসীনের ভান করতে সবাই ধরে নিলো লোকটা উদাসীন।' সত্যি-সত্যি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যখন অসতর্ক মুহূর্তে কাতরে উঠেছি, তখন তারা রটালো যে ওটাও ছল।

দুনিয়াটা খেপে গেছে।

তবে কি মোট কথা এই দাঁড়ায় না যে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার গতি নেই?

এতো যন্ত্রণা সত্বেও আত্মহত্যার কথা মনে হতে ডুকরে কেঁদে উঠলাম!

একটা গল্প আছে, কোনো এক বসন্তের সোনালি সকালে যখন দু-তিনটে বদরি ফুল সবে ফুটেছে তখন তারই শাখায় হিদেলবুর্গের (Hidelbrg) জনৈক তরুণ ছাত্রকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিলা।

"মা, লক্ষীটি আমায় গাল মন্দ-করো।

"কেন?"

"সবাই বলে আমার চরিত্র দুর্বল।

"বলে নাকি? দুর্বলচিত্ত? আমার তো মনে হয় না এ নিয়ে তোমায় আর বকবার দরকার আছে।"

মায়ের ভালোমানুষির কোনো সীমা নেই। তাঁর কথা মনে হলেই আমার চোখে জল ভরে আসে। আমার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

দয়া করে আমায় ক্ষমা করো। এই একবার অন্তত আমায় ক্ষমা করো।

নববর্ষের কবিতা

বছরগুলো
এখনও চোখে দেখতে পায় না
তবুও ছোট্ট ঐ বকের ছানাগুলো
কী করে পায় এমন পূর্ণতা!

মর্ফিন, এট্রোমল, নার্কোপন, ফিলিপন, প্যান্টোপন, পাবিনল, পানোপিন এট্রোপিন।

আত্মমর্যাদা কি? আত্মমর্যাদা!

"আমি অভিজাতদের একজন", "আমি গুণবান" ইত্যাদি না ভেবে কোনো মানুষ—না কোনো পুরুষের পক্ষেই বাঁচা অসম্ভব।

আমি মানুষকে ঘৃণা করি, তারাও আমায় ঘৃণা করে।

বুদ্ধির পরীক্ষা।

গাম্ভীর্য=নির্বুদ্ধিতার অনুভূতি।

যাই হোক এ বিচারে কোনো সন্দেহ নেই যে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে ছলনার আশ্রয় নিতেই হবে।

ঋণ ভিক্ষা করে লেখা একখানি চিঠি।—

"তোমার উত্তর।

দয়া করে উত্তর দিও।

আর এমন উত্তর দিও যেন, আমার মন খুশি হয়ে ওঠে।

সব রকমের অপমান আশঙ্কা করে আপন মনে দগ্ধে মরছি।

অভিনয় নয়। বাস্তবিকই নয়।

আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছি।

এতোটুকু বাড়িয়ে বলছি না।

প্রতিদিন প্রত্যহ তোমার উত্তরের অপেক্ষায় কাটে। অহোরাত্র ভয়ে কাঁপতে থাকি।

আমায় ধুলোয় মিশে যেতে বোলো না।

আমি যেন শুনতে পাই দেওয়ালগুলো আমায় দেখে চাপা হাসি হাসছে। গভীর রাত্রি আমার বিছানায় ছটফট ক'রে কাটে।

বোন আমার!"

এ পর্যন্ত পড়ে "চন্দ্রমল্লিকা-পত্রিকা" বন্ধ করে কাঠের বাকসের ভেতর রেখে দিলাম। এগিয়ে গিয়ে জানলা খুলে দিলাম এবং বৃষ্টি

ধারায় ধোঁয়াটে বাগানের দিকে তাকিয়ে সেই সব দিনের কথা ভাবতে বসলাম।

তারপর থেকে ছ বছর পার হয়ে গেছে। নাওজির এই আফিং-এর নেশাই শেষ পর্যন্ত আমার বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। না, একথা বলা ঠিক হলো না। আমার মনে হয় জন্ম থেকেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমার কপালে লেখা হয়ে গেছে। নাওজি যদি নেশা না-ও করতো, তবুও একদিন না একদিন আর কোনো কারণে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতো। ডাক্তারখানার বাকি হবার দরুন নাওজি প্রায়ই টাকার জন্য আমাকে উত্ত্যক্ত করতো। তখন আমার সবে বিয়ে হয়েছে, কাজেই টাকাকড়ির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। তাছাড়া স্বামীর টাকা এভাবে লুকিয়ে ভাইকে দেবো, একথা ভাবতে খুব খারাপ লাগতো। আমার বাপের বাড়ির ঝি ওসেকির সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের বালা হার দামী পোশাক ইত্যাদি বিক্রি করাই স্থির করলাম। নাওজির একটা চিঠির শেষে ছিলো—"এতো লজ্জা ও উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছি যে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে বা টেলিফোনে কথা বলতে পর্যন্ত পারি না। ওসেকির মারফৎ ঔপন্যাসিক উয়েহারা জিরোর ঠিকানায় টাকাটা পাঠিও (ঠিকানাটা চিঠিতে দেওয়া ছিলো)। আশা করি ভদ্রলোককে তুমি চেনো, অন্তত নামে পরিচয় আছে। মিস্টার উয়েহারার মন্দলোক বলে বাজারে বদনাম আছে, আসলে ভদ্রলোক ঠিক সেরকম নন। তাঁর ঠিকানায় টাকা পাঠাতে দ্বিধা কোরো না। তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, টাকা পেলেই আমায় ফোন করে জানিয়ে দেবেন। কাজেই সেইরকম ব্যবস্থা করো। মায়ের কাছ থেকে এই নেশার কথাটা গোপন রাখতে চাই। তিনি টের পাবার আগেই নিজেকে শুধরে নেবো। এবার তোমার টাকাটা পেলে ডাক্তারখানার সব দেনা শোধ করে দেবো। তারপর আমাদের পাহাড়ি বাংলোয় যাবো

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সত্যি বলছি। যেদিন আমি ঋণমুক্ত হবো, সেদিনই নেশা করা একেবারে ছেড়ে দেবো। ঈশ্বরের দিব্যি। দয়া করে আমায় বিশ্বাস করো, লক্ষ্মীটি মাকে জানিও না আর টাকাটা উয়েহারার কাছে পৌঁছে দিও।"

চিঠির মোট বক্তব্য ছিলো এই। তার নির্দেশ অনুসারে মিস্টার উয়েহারার বাড়িতেই গোপনে টাকা নিয়ে গেলো ওসেকি, কিন্তু বরাবরের মতো এবারেও নাওজির কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। শরীর সারতে বাংলোয় সে গেলো না। বরং উল্টে এই নেশার বিষক্রিয়া শুরু হলো এবং ক্রমেই নেশাটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছলো। টাকার তাগিদে তার চিঠির ধারা উদ্বেগে এমন রূপ নিলো যাকে আর্তনাদ বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রতি চিঠিতেই "আমি নেশা ছেড়ে দেবো বলে শপথ নিলাম"—এর পরেই এমন মারাত্মক হৃদয়-বিদারক এক শপথ নিয়ে বসে যে, চিঠি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারি এবারেও মিথ্যা বলছে, তবু নিজের আরও একটি গয়না ওসেকির হাতে তুলে দি, টাকাটা মিস্টার উয়েহারার কাছে ঠিকই পৌঁছে যায়।

"এই উয়েহারা লোকটি কেমন?"

"বেঁটে, কালো, বিচ্ছিরি," বলে ওসেকি,—"কিন্তু আমি যে সময়ে যাই, বেশির ভাগ দিনই তিনি বাড়ি থাকেন না। তাঁর স্ত্রী আর বছর ছয়েকের এক কচি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। স্ত্রী যে খুব সুন্দরী তা নয়, তবে ভারী মিষ্টি আর চটপটে। তাঁর মতো মেয়ের হাতে টাকা রেখে আসতে ভাবনা হয় না।"

এখনকার 'আমি'র সঙ্গে সেদিনের 'আমি'র যদি তুলনা করো তবে দেখবে এতো তফাৎ যে কোনো তুলনাই চলে না। আমি তখন মেঘের রাজ্যে বিচরণ করতাম, কোনো দুশ্চিন্তা আমার কাছে ঘেঁষতে পারতো না। তা সত্ত্বেও যখন ক্রমাগত টাকার পর টাকা

বেরিয়ে যেতে লাগলো এবং এক সময়ে টাকার অঙ্কটা দুঃস্বপ্নের আকার ধারণ করলো, তখন দারুন ভয় পেলাম। একদিন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে, গাড়ি ফেরত দিয়ে, হেঁটেই চললাম উয়েহারার বাড়ির উদ্দেশে।

মিস্টার উয়েহারা একা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। জাপানী পোশাকে তাঁকে একই সঙ্গে বুড়োটে আর কচি মনে হচ্ছিলো। প্রথম দর্শনে মনে হলো, এ এক অভিনব জন্তু যা আগে কখনো দেখিনি।

"আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে রেশন আনতে গেছেন।" ঈষৎ নাকি সুরে কেটে-কেটে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। আমায় দেখে তাঁর স্ত্রীর কোনো বন্ধু ভেবেছিলেন। নাওজির বোন বলে পরিচয় দিতে জোরে হেসে উঠলেন। কেন জানি না সারা শরীরটা কেঁপে উঠলো।

"বেরুলে হয় না?" প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই একখানা ক্লোক গায়ে চাপিয়ে, নতুন একজোড়া চটি পায়ে গলিয়ে আমার আগে-আগেই বারান্দা পেরিয়ে রওনা হলেন।

শীতের গোড়ার দিকের সন্ধ্যা। হিমেল হাওয়া মনে হলো যেন সোজা নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসছে। মিঃ উয়েহারা হাওয়া বাঁচাতেই যেন ডান কাঁধটা তুলে নিঃশব্দে হাঁটছেন। প্রায় দৌড়তে-দৌড়াতেই পেছন-পেছন চলেছি।

টোকিও থিয়েটারের পেছন দিকে একটা বাড়ির মাটির নীচেকার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চার-পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে খদ্দেররা লম্বা সরু ঘরখানায় টেবিল ঘিরে বসে মদ খাচ্ছে। মিঃ উয়েহারা মদের ছোট্ট পেয়ালার বদলে গেলাসে ঢেলে মদ খেলেন। আরেকটা গেলাস আনতে বলে আমায় মদ খেতে অনুরোধ করলেন। দু-গেলাস খেলাম কিন্তু বিশেষ কিছু মনে হলো না।

মিঃ উয়েহারা নিঃশব্দে মদ আর সিগারেট চালাতে লাগলেন। জীবনে এই প্রথম এমন জায়গায় পা দিয়েও আমার বিশেষ খারাপ লাগছিল না। বরং ভালোই লাগলো।

"ভালো মদ বরং ভালো হতো, কিন্তু যাহোক···"

"মাপ করবেন, কি বললেন?"

"মানে তোমার ভায়ের কথা বলছি। সে যদি মদের দিকে ঝুঁকতো তবে ভালো হতো। বহুকাল আগে কোনো সময়ে আফিংয়ের নেশা আমারও ছিল, আমি জানি লোকে একে কতো হীন চোখে দেখে। মদ প্রায় এই জাতীয় পদার্থ হলেও তার প্রতি মানুষের আশ্চর্য পক্ষপাত আছে। আমার ইচ্ছে আছে তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরাবো। তোমার কিরকম লাগে?"

"আমি একবার একটি মাতাল দেখেছিলাম। নববর্ষের দিন বাড়ি-বাড়ি দেখা করতে বেরুবো, এমন সময়ে আমাদের গাড়ির ভেতর কুৎসিত লাল মুখওয়ালা একটা লোক দেখলাম নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে—আমাদের ড্রাইভারের বন্ধু। আমি আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। ড্রাইভারের মুখে শুনলাম লোকটা পাঁড় মাতাল। গাড়ি থেকে টেনে বের করে তাকে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে গেলো। যেন হাড়গোড় নেই—এমনিভাবে লোকটার শরীরটা এদিক-ওদিক টাল খেতে লাগলো, আর সারাক্ষণ কি যেন বিড়বিড় করছিল। আমার জীবনে সেই প্রথম মাতাল দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়েছিলাম।

"আমিও একজন মদ্যপ, জানো তো?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেরকম নয় নিশ্চয়ই।"

"এবং তুমিও তেমন এক মাতাল।"

"না, এটা ঠিক নয়, আমি সত্যিকারের মাতাল দেখেছি, তার চেহারাই আলাদা।"

এই প্রথম ভদ্রলোক প্রাণখুলে হাসলেন।—"তাহলে হয়তো তোমার ভাইকে মদ ধরানো যাবে না, তবু মদ ধরলে তার উপকারই হতো। চলো এবার ওঠা যাক। দেরি করতে চাও না আশা করি।"

"তাতে কিছু এসে যায় না।"

"সত্যি কথা বলতে জায়গাটায় ভিড় বড্ড বেশি। ওয়েট্রেস, বিল।"

"অনেক খরচ হলো কি? খুব বেশি না হলে আমার কাছেও তো কিছু আছে।"

"তবে বিলটা তুমিই চুকিয়ে দাও।"

"সবটা নাও কুলোতে পারে।" ব্যাগের ভেতর চোখ বুলিয়ে মিঃ উয়েহারাকে কতো টাকা আছে বললাম।

"ঐ টাকায় আরও দু-জায়গায় মদ খাওয়া চলতে পারে। বোকা মেয়ে কোথাকার!" ভুরু কুঁচকে কথাটা বলেই ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

"আর কোথাও বুঝি যাবেন মদ খেতে?"

উনি মাথা নাড়লেন। "না, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকি, তুমি বরং বাড়ি যাও।"

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে নীচের তলা থেকে উঠে এলাম। উয়েহারা আমার একধাপ ওপরে ছিলেন। হঠাৎ পেছন ফিরে আমায় চুমু খেলেন। ঠোঁট শক্ত করে চেপে থেকে তাঁর চুম্বন গ্রহণ করলাম। তাঁর প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ আমার আসেনি, কিন্তু সেই সময় থেকেই আমার "গোপন" কথার জন্ম। মিঃ উয়েহারা সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেলেন, আমি ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করলাম, মনের ভেতর স্বচ্ছ অনুভূতি! বাইরে বেরিয়ে নদীর হাওয়ায় প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেলো।

তিনি আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন, কোনো কথা না বলেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পুরনো নড়বড়ে ট্যাক্সির মধ্যে ঝাঁকুনি খেতে খেতে মনে হলো পৃথিবীটা হঠাৎই সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে গেছে।

একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে মন খারাপ করে বসে আছি হঠাৎ তার মাথায় ঢোকালাম, "আমার একজন ভালবাসার মানুষ আছে।"

"জানি। হোসাডা, তাই না? তুমি তাকে ছাড়তে পারো না?"

আমি চুপ করে রইলাম।

যখনই আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হতো, তখনই এই কথা উঠতো। মনে মনে ভাবতাম, "সব বুঝি গেলো।" এ যেন পোশাকের জন্য ভুল কাপড় কেনা, একবার ছেঁটে ফেললে জোড়া দেওয়া চলে না। সবটা ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন কাপড় কিনে আবার শুরু করতে হয়।

একদিন রাত্তিরে স্বামী জিগগেস করলেন, আমার পেটের ছেলেটি কার? হোসাডার? ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। এখন বুঝতে পারি সে সময় আমি ও আমার স্বামী দুজনেই কতো ছেলেমানুষ ছিলাম। ভালবাসা কাকে বলে তা আমি জানতাম না। সহজ স্নেহের তাৎপর্য পর্যন্ত আমার জানা ছিলো না। হোসাডার আঁকা ছবির সম্বন্ধে এমন অন্ধভক্তি ছিলো যে, চেনাশোনা সবাইকে বলে বেড়াতাম অমন একজন লোকের স্ত্রী হতে পারলে জীবনের প্রতিটি দিন কী অপরূপ হয়ে ওঠে; তাঁর মতো রুচি যার নেই, তেমন মানুষকে বিয়ে করা বৃথা। কাজে-কাজেই সবাই ভুল বুঝতো, আর যে-আমি স্নেহ-ভালবাসা সম্বন্ধে কিছু জানি না বলেই সবার সামনে বলে বেড়াতাম যে, আমি হোসাডাকে ভালবাসি। কথাটা বলে ফেলে কখনও প্রত্যাহার করার চেষ্টা না করায় ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়ালো। ফলে আমার দেহের মধ্যে ঘুমন্ত ক্ষুদ্র মানব-শিশুটির প্রতিও আমার স্বামীর

সন্দেহ জাগলো। দুজনের মধ্যে কেউই বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা তুললাম না, অথচ দিনে-দিনে আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠলো। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে এলাম। মৃত শিশু প্রসবের পর, অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলাম, এর আগেই স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমার বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী ধরে নিয়ে নাওজি গলা ফাটিয়ে নিজের মরণ কামনা করে কেঁদে-কেঁদে চোখ-মুখের চেহারা বিচ্ছিরি করে তুললো। আমি তাকে জিগগেস করলাম, "ডাক্তারখানায় আর কতো বাকি আছে?" ধারণাতীত এক বিরাট অঙ্ক আমার কাছে সে স্বীকার করলো। পরে জেনেছিলাম যে, সে মিথ্যা বলেছিল, আসল অঙ্কটা তারও তিনগুণ, সেকথা সে স্বীকার করতে ভরসা পায়নি।

আমি বললাম, "তোমার মিঃ উয়েহারার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। চমৎকার মানুষ। মাঝে মাঝে তিনজন মিলে মদ খেতে বেরোলে বেশ মজা হয়,—কি বলো? ধেনো মদ যে এতো শস্তা, আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। তুমি যদি ধেনোমদ চালিয়ে যাও, তবে তার খরচ পোষানো আমার পক্ষে কঠিন হবে না। ডাক্তারখানায় ধারের জন্য চিন্তা কোরো না। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

উয়েহারার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এবং তাঁকে আমার ভালো লেগেছে শুনে নাওজির তো গদগদ অবস্থা। সেই রাতেই আমার কাছ থেকে টাকা পাওয়া মাত্র ভদ্রলোকের বাড়ি ধাওয়া করলো

নেশাটা বোধহয় মনের রোগ। আমি তো মিঃ উয়েহারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম, আর ভাইয়ের কাছ থেকে তাঁর বই ধার করে পড়তে শুরু করলাম। পড়া হলে মন্তব্য করতাম,

এমন প্রেমিক আর হয় না। আমি যে ভদ্রলোকের একজন সমঝদার, একথা আবিষ্কার করে নাওজি তো অবাক! খুশির চোটে আমায় ওর আরও সব উপন্যাস জোগাড় করে দিতে লাগলো। নিজের অজান্তে, কবে যে তাঁর বই এতো মন দিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছি, তা টের পেলাম না, নাওজির সঙ্গে তাঁকে নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করি। প্রায় প্রতিরাত্রে নাওজি মিঃ উয়েহারার সঙ্গে মদের আড্ডায় চলে যায়। মিঃ উয়েহারার মতলব-মতো নাওজি ক্রমে ক্রমে মদের নেশায় মশগুল হয়ে গেলো। নাওজিকে না জানিয়ে মাকে জিগগেস করলাম, "ডাক্তারখানার ধারের কি ব্যবস্থা হবে?" একহাতে মুখ ঢেকে মা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলেন, তারপর মুখ তুলে, ম্লান হেসে জবাব দিলেন, "কি যে উপায় হবে বুঝতে পারছি না। জানি না কবে, কতো বছরে এ বোঝা নামবে। যাই হোক, প্রতিমাসে কিছু করে শোধ দিতেই হবে।"

এরপরে ছটি বছর কেটে গেছে।

চন্দ্রমল্লিকা! হ্যাঁ, নাওজির পক্ষেও অবস্থাটা শোচনীয় নিশ্চয়ই। আজ অবধিও উদ্ধারের সব রাস্তাই ওর বন্ধ, তাছাড়া কি করে যে কি করা যায় এ ধারণাই ওর নেই। মরণের আশাতেই সে বোধহয় রোজ মাতাল হয়।

নিজেকে নষ্ট হতে ছেড়ে দিলে আমিই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম, কে জানে! বোধহয় তাহলে নাওজির পক্ষেও সহ্য করা সহজ হতো।

নাওজি নোট বইয়ে লিখেছে—কে যে মন্দ নয় তা তো জানি না। এই কথা পড়ে আমার নিজেকে, আমাকে এমন কি আমার মাকে পর্যন্ত নীতিভ্রষ্টা বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় নীতিহীনতা বলতে ও স্নেহের দৌর্বল্য বোঝাতে চেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় | পত্রাবলী

তাঁকে চিঠি লিখবো না আর কোনো ব্যবস্থা করবো কিছুতেই মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। আজ সকালে হঠাৎ "সর্পের ন্যায় সতর্ক এবং কপোতের মতো নিরীহ"—যীশুর এই উক্তি মনে পড়ে গেলো ; সাহসে ভর করে চিঠি লিখে দিলাম।

নাওজির বোন আমি। আমায় যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, দয়া করে মনে করার চেষ্টা করুন।

নাওজি আবার বেয়াড়াপনা শুরু করেছে এবং আপনাকে উত্যক্ত করছে এজন্য প্রথমেই মাপ চেয়ে নিই। (মরুকগে, তার ব্যাপার সেই বুঝুক, আমার পক্ষে আগুবেড়ে মাপ চাইতে যাবার কোনো মানে হয় না।) আজ নাওজির জন্য নয়, নিজের জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু ভিক্ষা করবো। তা মুখে শুনেছি আপনাদের পুরনো বাড়িটা যুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে গেছে ব আপনারা নতুন ঠিকানায় উঠে গেছেন। ভেবেছিলাম সেখানে গিয়ে আপনা সঙ্গে দেখা করবো (বাড়িটা বোধহয় টোকিওর বাইরে অনেক দূর শহরতলিতে) কিন্তু সম্প্রতি মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না, তাঁকে ফেলে টোকিও পর্যন্ত যাওয় চলে না। সেইজন্যই চিঠি লেখা।

আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেটা হয়তো কোনো তরুণীর পক্ষে অশালীন এমন কি রীতিমত অপরাধ বলেও গণ্য,—কিন্তু আমি, না আমরা—আর এ অবস্থায় থাকতে পারি না। সুতরাং আমার ভাই নাওজির সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন আপনাকেই আমি অনুরোধ করছি, আমার নিরাবরণ-নিরাভরণ অনুভূতিগুলে শুনে পথ বেছে দেবার জন্য।

আমার বর্তমান জীবন অসহ্য। পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়—আমাদের (মা, নাওজি আর আমার) পক্ষে এইভাবে আর বেঁচে থাকা অসম্ভব।

গতকাল সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনার সঙ্গে জ্বর-জ্বর ভাবও ছিল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো, নিজেকে নিয়ে যে কি করি ভেবে পাচ্ছিলাম না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এক চাষী মেয়ে রাস্তা দিয়ে ভিজতে-ভিজতে এক বোঝা চাল পিঠে করে নিয়ে এলো। যে কাপড়গুলো তাকে দেবো বলেছিলাম, দিয়ে দিলাম। খাবার ঘরে আমার মুখোমুখি বসে চা খেতে-খেতে সে সোজাসুজিই আমায় প্রশ্ন করলো,—"এভাবে নিজেদের জিনিস বেচে আর কদ্দিন চলবে?"

আমি জবাব দিলাম, "ছমাস, বড়োজোর বছর খানেক। তারপরে ডান হাতে মুখখানা আড়াল করে বললাম, "ঘুম। ঘুমে আমার দুচোখ ভেঙে আসছে।"

"তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত, এ তোমার মনের অবসাদ।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক।" চোখ ছলছল করছিলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম, দুটো কথাই মনের মধ্যে গুমরে উঠলো। 'বাস্তব' এবং 'কল্পনা'। বাস্তব সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই। সম্ভবত সেই কারণেই যে আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে, এই আশঙ্কায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মা প্রায় অথর্ব, বিছানাতেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। নাওজির মানসিক অসুখের কথাও আপনার অবিদিত নেই। এখানে যতক্ষণ থাকে, পাড়ার তাড়িখানায় কাটায়, আর দুদিন অন্তর আমাদের কাপড় বেচা টাকায় টোকিওতে ফুর্তি করতে যায়। কিন্তু দুঃখ আমার সেজন্য নয়। আমার ভয় হয়। কেননা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পোকা-ধরা পাতার মতো যা ঝরেও পড়ে না অথচ গাছে শুকিয়ে যায়, আমিও দিনে-দিনে আমার অস্তিত্বকে নিঃশেষ করছি। এটাই আমার কাছে অসহ্য; তাই আমি পরিত্রাণ চাই—এরজন্য যদি যুবতী-ধরমকে জলাঞ্জলি দিতে হয় তবুও। এখন আপনি বলুন আমি কি করি।

এবার আমি আমার মা এবং নাওজিকে জোর গলায় জানাতে চাই, দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে চাই কিছুকাল হলো আমি একজনকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছি এবং এখন থেকে আমি তাঁর রক্ষিতা হয়ে থাকবো। আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কার কথা বলছি। তাঁর সংক্ষিপ্ত সহি এম, সি। যখন কোনো আঘাত পাই, তখন প্রবল ইচ্ছে হয় তাঁর কাছে ছুটে চলে যেতে—মনে হয় তার প্রেমে নিজেকে বিসর্জন দিই।

আপনার মতো এম, সিরও স্ত্রী-কন্যা আছে। তাঁকে দেখে মনে হয় আমার

চতুর্থ অধ্যায় / পত্রাবলী

তাঁকে চিঠি লিখবো না আর কোনো ব্যবস্থা করবো কিছুতেই মনঃস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। আজ সকালে হঠাৎ "সর্পের ন্যায় সতর্ক এবং কপোতের মতো নিরীহ"—যীশুর এই উক্তি মনে পড়ে গেলো ; সাহসে ভর করে চিঠি লিখে দিলাম।

নাওজির বোন আমি। আমায় যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, দয়া করে মনে করার চেষ্টা করুন।

নাওজি আবার বেয়াড়াপনা শুরু করেছে এবং আপনাকে উত্ত্যক্ত করছে, এজন্য প্রথমেই মাপ চেয়ে নিই। (মরুকগে, তার ব্যাপার সেই বুঝুক, আমার পক্ষে আগুবেড়ে মাপ চাইতে যাবার কোনো মানে হয় না।) আজ নাওজির জন্য নয়, নিজের জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু ভিক্ষা করবো। তার মুখে শুনেছি আপনাদের পুরনো বাড়িটা যুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে গেছে বলে আপনারা নতুন ঠিকানায় উঠে গেছেন। ভেবেছিলাম সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো (বাড়িটা বোধহয় টোকিওর বাইরে অনেক দূর শহরতলিতে), কিন্তু সম্প্রতি মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না, তাঁকে ফেলে টোকিও পর্যন্ত যাওয়া চলে না। সেইজন্যই চিঠি লেখা।

আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেটা হয়তো কোনো তরুণীর পক্ষে অশালীন, এমন কি রীতিমত অপরাধ বলেও গণ্য,—কিন্তু আমি, না আমরা—আর এ অবস্থায় থাকতে পারি না। সুতরাং আমার ভাই নাওজির সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন, আপনাকেই আমি অনুরোধ করছি, আমার নিরাবরণ-নিরাভরণ অনুভূতিগুলো শুনে পথ বেছে দেবার জন্য।

আমার বর্তমান জীবন অসহ্য। পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়—আমাদের (মা, নাওজি আর আমার) পক্ষে এইভাবে আর বেঁচে থাকা অসম্ভব।

গতকাল সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনার সঙ্গে জ্বর-জ্বর ভাবও ছিল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো, নিজেকে নিয়ে যে কি করি ভেবে পাচ্ছিলাম না। ত্বপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এক চাষী মেয়ে রাস্তা দিয়ে ভিজতে-ভিজতে এক বোঝা চাল পিঠে করে নিয়ে এলো। যে কাপড়গুলো তাকে দেবো বলেছিলাম, দিয়ে দিলাম। খাবার ঘরে আমার মুখোমুখি বসে চা খেতে-খেতে সে সোজাসুজিই আমায় প্রশ্ন করলো,—"এভাবে নিজেদের জিনিস বেচে আর কদ্দিন চলবে?"

আমি জবাব দিলাম, "ছমাস, বড়োজোর বছর খানেক। তারপরে ডান হাতে মুখখানা আড়াল করে বললাম, "ঘুম। ঘুমে আমার দুচোখ ভেঙে আসছে।"

"তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত, এ তোমার মনের অবসাদ।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক।" চোখ ছলছল করছিলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম, দুটো কথাই মনের মধ্যে গুমরে উঠলো। 'বাস্তব' এবং 'কল্পনা'। বাস্তব সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই। সম্ভবত সেই কারণেই যে আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে, এই আশঙ্কায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মা প্রায় অথর্ব, বিছানাতেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। নাওজির মানসিক অসুখের কথাও আপনার অবিদিত নেই। এখানে যতক্ষণ থাকে, পাড়ার তাড়িখানায় কাটায়, আর দুদিন অন্তর আমাদের কাপড় বেচা টাকায় টোকিওতে ফুর্তি করতে যায়। কিন্তু দুঃখ আমার সেজন্য নয়। আমার ভয় হয়। কেননা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পোকা-ধরা পাতার মতো যা ঝরেও পড়ে না অথচ গাছে শুকিয়ে যায়, আমিও দিনে-দিনে আমার অস্তিত্বকে নিঃশেষ করছি। এটাই আমার কাছে অসহ্য; তাই আমি পরিত্রাণ চাই—এরজন্য যদি যুবতী-ধরমকে জলাঞ্জলি দিতে হয় তবুও। এখন আপনি বলুন আমি কি করি।

এবার আমি আমার মা এবং নাওজিকে জোর গলায় জানাতে চাই, দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে চাই কিছুকাল হলো আমি একজনকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছি এবং এখন থেকে আমি তাঁর রক্ষিতা হয়ে থাকবো। আপনি নিশ্চয় জানেন আমি কার কথা বলছি। তাঁর সংক্ষিপ্ত সহি এম, সি। যখন কোনো আঘাত পাই, তখন প্রবল ইচ্ছে হয় তাঁর কাছে ছুটে চলে যেতে—মনে হয় তার প্রেমে নিজেকে বিসর্জন দিই।

আপনার মতো এম, সিরও স্ত্রী-কন্যা আছে। তাঁকে দেখে মনে হয় আমার

চেয়ে রূপসী এবং অল্প-বয়েসী বান্ধবী তাঁর অনেক আছে। তবু মনে হয়, তাঁকে না পেলে আমি বাঁচবো না। এম, সির স্ত্রীকে আমি কখনো দেখিনি। তবে শুনেছি তাঁর স্বভাব অতি মিষ্টি। তাঁর কথা ভাবলে নিজের চোখেই নিজেকে অযথা মনে হয়। তবু আমার বর্তমান জীবন আরও ভয়াবহ, সেই কারণে এম, সি-র কাছে আবেদন আমি করবোই, কোনো বিবেচনাই আমার এ সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারবে না। "সর্পের ন্যায় সতর্ক এবং কপোতের মতো নিরীহ" আমার এ প্রেম চরিতার্থ করবোই, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, মা, নাওজি বা দুনিয়ার আর কেউ আমার এ আচরণ সমর্থন করবে না। আপনার কথা বলতে পারি না। মোট কথা, নিজের কর্তব্য স্থির করে সেই ভাবে চলা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নেই, একথা ভেবে নিজের মনে কেঁদে মরি। জীবনে এই প্রথম আমার নিজের বলতে কিছু হবে, কিন্তু আশেপাশে আর পাঁচজনের বাহবা কুড়িয়ে এ কাজ কি করে করা যায়, সে খবর আমার জানা নেই। আমি ভেবে-ভেবে সারা হচ্ছি যেন বীজগণিতের এক কঠিন সমস্যায় দিশেহারা হয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম ভুলটা কোথায় এবং তার ফলে খুশিতে মন ভরে উঠেছে।

কিন্তু আমার প্রেমাস্পদ এম, সি কি বলেন? এটা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর প্রশ্ন। আপনি আমাকে গায়ে-পড়া ভাবতে পারেন,—কি বলবো? গায়ে-পড়া বৌ তো আর বলতে পারি না, বরং বলা যায় উপযাচিকা। এ অবস্থায় এম, সি, যদি বলেন আমায় বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তবে আমার বলার কিছু নেই। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। আপনি কি তাঁকে জিগগেস করতে পারেন? বছর কয়েক আগে আমার মনে রামধনু হালকা রঙ লেগেছিল। তার মধ্যে না ছিল প্রেম, না ছিল কাম। কিন্তু দিনে দিনে তার রঙ গভীরে মিশেছে, গাঢ় হয়েছে। আমার মন থেকে সে রঙ কখনো মোছেনি। বৃষ্টি ঝরে যাবার পর আকাশে যে রামধনু, সেটা স্বল্পায়ু, কিন্তু মানুষের মনের রঙ তো অতো সহজে মুছে যায় না। দয়া করে তাঁকে জিগগেস করবেন, আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা? হয়তো তিনি আমায় বৃষ্টি ঝরা আকাশের গায়ে রামধনুর মতো ভেবেছেন, এবং তা কি এরই মধ্যে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

যদি তাই হয়, তবে আমি আমার মনের রামধনুটিও মুছে ফেলবো। কিন্তু আমার জীবনটাকে যতক্ষণ না মুছে ফেলতে পারি, ততক্ষণ রামধনুর রঙ ফিকে হবে না।

উত্তরের প্রার্থনা জানিয়ে রাখি।

উয়েহারা জিরো সমীপেষু (আমার শেখভ। এম, সি)

পুনশ্চ :—সম্প্রতি আমার ওজন বেড়েছে। তার মানে আমার ধারণা আমি দিন-দিন জঙলি ভূত হচ্ছি না, বরং মানুষ হচ্ছি। এই গ্রীষ্মে ডি, এইচ, লরেন্সের উপন্যাস (মাত্র একখানা) পড়েছি।

'আপনার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে আমি আবার চিঠি লিখতে বসেছি। আমার আগের চিঠিখানা অত্যন্ত কূট ষড়যন্ত্রে পূর্ণ। বোধহয় আপনি সবটা ধরে ফেলেছেন। হ্যাঁ, সেকথা সত্যি। চিঠির প্রতিটি লাইন ছলাকলায় ভর্তি ছিলো। আমার মনে হয় আপনি ভেবেছিলেন যে, জীবনধারণের জন্য অর্থ সংস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য। সে কথা অস্বীকার করি না। যাই হোক, ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, শুধু মুরুব্বির সন্ধানই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো, তবে বিশেষ করে আপনাকে বেছে নিতাম না। আমার ধারণা বিত্তবান অনেক বৃদ্ধই আমার ভারবহনে রাজি। সত্যি বলতে কি, বেশি দিনের কথা নয়, আমার কাছে একটা বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত এসেছিল। আপনি ভদ্রলোককে চিনলেও চিনতে পারেন। ষাটের ওপর বয়েস, বিপত্নীক, সম্ভবত শিল্প-আকাদেমির সদস্য। এই স্বনামধন্য শিল্পী আমাদের পাহাড়তলির বাড়িতে এসে আমার পাণি প্রার্থনা করেন। নিশিকাতা স্ট্রীটে ভদ্রলোক আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, মাঝে-মাঝে পাড়ার সভা-সমিতিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। মনে পড়ে শরতের এক সন্ধ্যায় গাড়ি করে এঁর বাড়ির সামনে দিয়ে মা আর আমি আসছিলাম, ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা গাড়ির জানলা দিয়ে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে তাঁকে নমস্কার করতেই হঠাৎ ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখের ওপর কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিলো।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "মা, একেই বোধহয় প্রেম বলে। ভদ্রলোক তোমার প্রেমে পড়েছেন।"

মা শান্তভাবে যেন নিজের মনেই উত্তর দিলেন,—"না, উনি মস্ত গুণী লোক।"

আমার ধারণা শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের বংশের ধারা।

ওয়াদামামার অন্তরঙ্গ এক রাজপুত্রের মারফৎ ভদ্রলোক মায়ের কাছে

আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান, কারণ কয়েক বছর আগে ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। মা বললেন, "যা ভালো বোঝো সেই মতো সোজা ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও।" বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই আমিও লিখে দিলাম, "বর্তমানে আমার বিবাহে আদৌ রুচি নেই।"

মাকে জিগগেস করলাম, "আমি অমত করলে তুমি কিছু মনে করবে না তো?"

"আমি নিজেই তো এটা উপযুক্ত সম্বন্ধ বলে মনে করি না।"

জাপানী আল্‌প্‌সে চিত্রকরের বাংলোয় আমার প্রত্যাখ্যান পত্র পাঠিয়ে দিলাম। এর দুদিন পরে, আমার চিঠি পাবার আগেই, আমার উত্তরের বিষয় কিছু না জেনে, কোনো খবর না দিয়ে ভদ্রলোক স্বয়ং আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত। তিনি খবর পাঠালেন যে, ইজুতে উষ্ণ প্রস্রবণে যাবার পথে অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। শিল্পীদের যতো বয়সই হোক না কেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেমানুষি তাঁদের কখনও যায় না।

মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, তাই আমি নিজেই তাঁকে চীনাঘরে অভ্যর্থনা করলাম। চা ঢালতে-ঢালতে বললাম,—"আমার প্রত্যাখ্যান পত্র এতোক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার বাসায় পৌঁছে গেছে। আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করে দেখলাম, কিন্তু কিছুতেই সম্ভব বলে মনে হলো না।

"তাই নাকি?" ভদ্রলোকের স্বরে অধৈর্য। ঘাম মুছে বললেন—"আশা করি আপনি আরেকবার বিবেচনা করে দেখবেন। হয়তো আমি—কেমন করে গুছিয়ে বলবো জানি না—আপনাকে মানসিক আনন্দ দিতে পারবো না, সেকথা সত্যি, কিন্তু অন্যভাবে—পার্থিব অর্থে আপনাকে সুখী করবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার আছে। এটুকু ভরসা আপনাকে দিতে পারি। আশা করি আমার ভাষা খুব স্থূল হয়নি।"

"আপনি যে সুখের কথা বলছেন, তার স্বরূপ আমার জানা নেই। ধৃষ্টতা মাপ করবেন, এক্ষেত্রে আমার একটিমাত্র উত্তরই জানাবার আছে, "না, ধন্যবাদ।" নীটশের ভাষায় বলতে গেলে আমি হচ্ছি সেই জাতীয় মেয়ে যে চায় মা হতে। আমি সন্তান চাই। সুখে আমার অনীহা। অর্থেও আমার ততোটুকুই আসক্তি, যতোটুকু সন্তানকে মানুষ করার জন্য প্রয়োজন।"

ভদ্রলোক অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, "আপনি অসামান্যা। প্রত্যেকে মনে-মর্মে যা চিন্তা করে, আপনি মুখে তা ব্যক্ত করতে পারেন। আপনার সঙ্গে জীবনটাকে বাঁধতে পারলে হয়তো নতুন করে কাজে উদ্দীপনা পাওয়া যেতো।"

সাজানো কথাগুলি আদৌ বুড়োমানুষের উক্তির মতো শোনালো না। হঠাৎ মনে হলো যে, এতো বড়ো শিল্পীর মনে নতুন অনুপ্রেরণা জাগাবার মতো আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে, তাহলে বেঁচে থাকা সার্থক। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও নিজেকে বৃদ্ধের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় কল্পনা করতে পারলাম না।

মৃদু হেসে জিগগেস করলাম,—"আমি যে আপনাকে ভালোবাসি না এতে আপনার কিছু এসে যাবে না?"

গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেন, "তাতে মেয়েদের কিছু এসে যায় না। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্ত।"

"কিন্তু আমার মতো মেয়ে ভালোবাসা ছাড়া বিয়ে কল্পনাও করতে পারে না। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আগামী বছর তিরিশে পা দেবো।" নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলাম।

তিরিশ! "তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত নারী দেহে কুমারী-সুলভ কোমলতা অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু তিরিশের পরে নারীদেহ নিঃস্ব, রিক্ত।" বহুদিন আগে ফরাসী উপন্যাসে পড়া এই কথাগুলো মনে পড়তেই এমন অবসাদ পেয়ে বসলো, যে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। বাইরে চোখ ফেরালাম। মধ্যদিনের রৌদ্রস্নাত সমুদ্রের চোখ-ধাঁধানো আলো ভাঙা কাঁচের টুকরোর সঙ্গেই ঝিকমিক করছিলো। মনে পড়লো উপন্যাসে ঐ লাইন পড়ে হয়তো সত্যি ভেবে সেদিন মনে মনে সায় দিয়েছিলাম! যে বয়সে নিশ্চিন্ত মনে তিরিশের কোঠায় মেয়েদের জীবনের সীমা টানতে পারতাম, সেই দিনগুলোর জন্য বুকের মধ্যে হু হু করে উঠলো। ভাবলাম, এই যে আমার গলার হার, মণিবন্ধ এবং দামী দামী পোশাকগুলো বেচে দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমার যৌবনের মাধুরীও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না তো? হায়রে হতভাগিনী বিগতযৌবনা! কিন্তু তবু, প্রৌঢ়ার জীবনও তো নারীরই জীবন, নয় কি? সম্প্রতি এই ধারণাই আমার হয়েছে। আমার উনিশ বছর বয়সে এক ইংরেজ শিক্ষিকা, দেশে ফেরার মুখে আমায়

আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান, কারণ কয়েক বছর আগে ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। মা বললেন, "যা ভালো বোঝো সেই মতো সোজা ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও।" বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই আমিও লিখে দিলাম, "বর্তমানে আমার বিবাহে আদৌ রুচি নেই।"

মাকে জিগগেস করলাম, "আমি অমত করলে তুমি কিছু মনে করবে না তো ?"

"আমি নিজেই তো এটা উপযুক্ত সম্বন্ধ বলে মনে করি না।"

জাপানী আল্প্সে চিত্রকরের বাংলোয় আমার প্রত্যাখ্যান পত্র পাঠিয়ে দিলাম। এর দুদিন পরে, আমার চিঠি পাবার আগেই, আমার উত্তরের বিষয় কিছু না জেনে, কোনো খবর না দিয়ে ভদ্রলোক স্বয়ং আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত। তিনি খবর পাঠালেন যে, ইজুতে উষ্ণ প্রস্রবণে যাবার পথে অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। শিল্পীদের যতো বয়সই হোক না কেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেমানুষি তাঁদের কখনও যায় না।

মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, তাই আমি নিজেই তাঁকে চীনাঘরে অভ্যর্থনা করলাম। চা ঢালতে-ঢালতে বললাম,—"আমার প্রত্যাখ্যান পত্র এতোক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার বাসায় পৌঁছে গেছে। আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করে দেখলাম, কিন্তু কিছুতেই সম্ভব বলে মনে হলো না।

"তাই নাকি ?" ভদ্রলোকের স্বরে অধৈর্য। ঘাম মুছে বললেন—"আশা করি আপনি আরেকবার বিবেচনা করে দেখবেন। হয়তো আমি—কেমন করে গুছিয়ে বলবো জানি না—আপনাকে মানসিক আনন্দ দিতে পারবো না, সেকথা সত্যি, কিন্তু অন্যভাবে—পার্থিব অর্থে আপনাকে সুখী করবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার আছে। এটুকু ভরসা আপনাকে দিতে পারি। আশা করি আমার ভাষা খুব স্থূল হয়নি।"

"আপনি যে সুখের কথা বলছেন, তার স্বরূপ আমার জানা নেই। ধৃষ্টতা মাপ করবেন, এক্ষেত্রে আমার একটিমাত্র উত্তরই জানাবার আছে, "না, ধন্যবাদ।" নীটশের ভাষায় বলতে গেলে আমি হচ্ছি সেই জাতীয় মেয়ে যে চায় মা হতে। আমি সন্তান চাই। সুখে আমার অনীহা। অর্থেও আমার ততোটুকুই আসক্তি, যতোটুকু সন্তানকে মানুষ করার জন্য প্রয়োজন।"

ভদ্রলোক অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, "আপনি অসামান্যা। প্রত্যেকে মনে-মনে যা চিন্তা করে, আপনি মুখে তা ব্যক্ত করতে পারেন। আপনার সঙ্গে জীবনটাকে বাঁধতে পারলে হয়তো নতুন করে কাজে উদ্দীপনা পাওয়া যেতো।"

সাজানো কথাগুলি আদৌ বুড়োমানুষের উক্তির মতো শোনালো না। হঠাৎ মনে হলো যে, এতো বড়ো শিল্পীর মনে নতুন অনুপ্রেরণা জাগাবার মতো আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে, তাহলে বেঁচে থাকা সার্থক। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও নিজেকে বৃদ্ধের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় কল্পনা করতে পারলাম না।

মৃদু হেসে জিগগেস করলাম,—"আমি যে আপনাকে ভালোবাসি না এতে আপনার কিছু এসে যাবে না?"

গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেন, "তাতে মেয়েদের কিছু এসে যায় না। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্ত।"

"কিন্তু আমার মতো মেয়ে ভালোবাসা ছাড়া বিয়ে কল্পনাও করতে পারে না। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আগামী বছর তিরিশে পা দেবো।" নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলাম।

তিরিশ! "তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত নারী দেহে কুমারী-সুলভ কোমলতা অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু তিরিশের পরে নারীদেহ নিঃস্ব, রিক্ত।" বহুদিন আগে ফরাসী উপন্যাসে পড়া এই কথাগুলো মনে পড়তেই এমন অবসাদ পেয়ে বসলো, যে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। বাইরে চোখ ফেরালাম। মধ্যদিনের রৌদ্রস্নাত সমুদ্রের চোখ-ধাঁধানো আলো ভাঙা কাঁচের টুকরোর সঙ্গেই ঝিকমিক করছিলো। মনে পড়লো উপন্যাসে ঐ লাইন পড়ে হয়তো সত্যি ভেবে সেদিন মনে মনে সায় দিয়েছিলাম! যে বয়সে নিশ্চিন্ত মনে তিরিশের কোঠায় মেয়েদের জীবনের সীমা টানতে পারতাম, সেই দিনগুলোর জন্য বুকের মধ্যে হু হু করে উঠলো। ভাবলাম, এই যে আমার গলার হার, মণিবন্ধ এবং দামী দামী পোশাকগুলো বেচে দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমার যৌবনের মাধুরীও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না তো? হায়রে হতভাগিনী বিগতযৌবনা! কিন্তু তবু, প্রৌঢ়ার জীবনও তো নারীরই জীবন, নয় কি? সম্প্রতি এই ধারণাই আমার হয়েছে আমার উনিশ বছর বয়সে এক ইংরেজ শিক্ষিকা, দেশে ফেরার মুখে আমায়

সাবধান করে দিয়েছিলেন,—"কখনো কাউকে ভালোবেসো না। প্রেম তোমার বড়ো যন্ত্রণা ডেকে আনবে। প্রেমে যদি পড়তেই হয়, অনেক বয়সে, তিরিশ পেরিয়ে প্রেম কোরো।"

তাঁর কথা নিঃশব্দে হজম করেছিলাম, মন তা গ্রহণ করেনি। সে সময়ে আমার পক্ষে ত্রিশোর্ধ্ব জীবনের কল্পনা করাও কঠিন ছিলো।

তিক্তস্বরে শিল্পী হঠাৎ বলে উঠলেন, "শুনলাম আপনারা বাড়িটা বেচে দেবেন? সত্যি?"

আমি হেসে উঠলাম, "মাপ করবেন, চেরি বাগানটা'র কথা মনে পড়লো। আপনি কি ওটা কিনবেন?"

ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হলো, উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক। শিল্পী মানুষ, আমার কথার ইঙ্গিত ধরতে কষ্ট হলো না।

বাড়িখানা যে এক রাজকুমারকে বেচে দেবার কথা চলছিল একথা সত্যি, কিন্তু শেষ অবধি কিছুই হয়নি। এরই মধ্যে শিল্পীর কানে খবরটা পৌঁছে গেছে জেনে অবাক হলাম। কিন্তু যেই বুঝলেন তাঁকে 'চেরি বাগানে'র সেই লোপাখিন-এর সমগোত্রীয় মনে করি, অমনি ভদ্রলোকের মেজাজ বিগড়ে গেলো। এরপর কয়েক মিনিট এটা-ওটা বলে উঠে পড়লেন।

লোপাখিন হতে আপনাকে বলি না এখন, সেটুকু ভরসা আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু দয়া করে মাঝবয়েসী রমণীর নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা ক্ষণেক অবধান করুন।

প্রায় বছর দুই আগে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সে সময়ে আপনাকে জানতাম আমার ভাইয়ের গুরু হিসেবে—অদ্ভুত ধরনের মন্ত্রণাদাতা, বেশি কিছু নয়। একসঙ্গে আমরা গেলাস ভরে মদ খেয়েছিলাম এবং আপনাকে একটু বেপরোয়া মনে হয়েছিল। রাগ হয়নি, চপলতার অদ্ভুত অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি আমার। আপনাকে আমার ভালোও লাগেনি, মন্দও লাগেনি—আসলে আমার তখন কোনো আবেগের বালাই ছিলো না। পরে ভাইকে খুশি করতে আপনার কয়েকটি উপন্যাস চেয়ে পড়েছিলাম, তার মধ্যে কয়েকটি ভালোই লেগেছিল, কয়েকটি লাগেনি। সত্যি বলতে আমি তেমন পড়ুয়া নই। কিন্তু গত ছ-বছরের মধ্যে ঠিক কোন সময় থেকে বলতে পারবো না,

আপনার স্মৃতি আমার মনকে জমাট কুয়াশার মতো ঘিরে রেখেছে এবং সে রাত্রে একতলা থেকে উঠে আসার সময়ে সিঁড়িতে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। কেমন যেন মনে হয় সেই নিমেষটিই আমার ভাগ্যকে স্থির করে দিলো। আপনার অভাব সবসময় অনুভব করি। হয়তো একেই প্রেম বলে এবং সেই সম্ভাবনায় নিজেকে এতো নিঃসঙ্গ মনে হয় যে মাঝে-মাঝে বাঁধভাঙ্গা কান্নায় নিজেকে ভাসিয়ে দি। পৃথিবীর আর সব পুরুষের চেয়ে আপনি ভিন্ন। "সী গল" উপন্যাসের নায়িকা নিনার মতো ঔপন্যাসিকের মোহ আমায় অভিভূত করতে পারে না। লেখকের প্রতি আমার আকর্ষণ কম। আমাকে সাহিত্য-সমঝদার বা ঐ ধরনের কিছু মনে করলে ভুল করবেন। আমি আপনার কাছ থেকে ছেলে চাই।

হয়তো অনেক—অনেকদিন আগে, যখন আমাদের কারোরই বিয়ে হয়নি, তখন দেখা হলে, আমাদের বিয়ে হতে পারতো। আর আমার আজকের এই যন্ত্রণার হাত থেকেও মুক্তি পেতাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আমার কখনও বিয়ে হবে না একথা আমি মেনে নিয়েছি। আপনার স্ত্রীর স্থান অধিকার করার চিন্তামাত্র বর্বরতা এবং তাতে নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে যাবে। আমি আপনার রক্ষিতা হতে রাজি। (শব্দটা নিজের কাছেই অসহ্য। "প্রেমিকা" লিখতে গিয়ে মনে হলো সাধারণ লোকে "রক্ষিতা" বলতে যা বোঝায় আমিও সেই কথাই বোঝাতে চাই, সেই কারণে সোজাসুজি লেখাই স্থির করলাম।) শুনেছি সাধারণত রক্ষিতাদের কপাল খারাপ হয়। লোকে বলে কাজ ফুরোলেই ছেঁড়া কাঁথার মতো তাকে বিদেয় করা হয়। আর পুরুষমানুষ, সে যেমনই হোক না কেন ঘাটের কাছাকাছি এসে ঘরমুখো হয়। আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বুড়োর সঙ্গে আমার নার্সের আলোচনা শুনেছিলাম একদিন। তাদের শেষ কথা হলো যে, মেয়েদের কোনোমতে "রক্ষিতা" হওয়া উচিত নয়। তারা অবশ্য বারবনিতার কথাই বলছিল, কিন্তু আমাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা।

আমার বিশ্বাস আপনার কাছে আপনার কাজই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো জিনিস এবং আমায় যদি আপনার পছন্দ হয় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে আপনার কাজের সুবিধা বই অসুবিধা হবে না। তাহলে আপনার স্ত্রীও আমাদের সম্পর্ক সহজেই মেনে নেবেন। অদ্ভুত শোনালেও যুক্তিতে কোনো ভুল নেই।

একমাত্র সমস্যা আপনার জবাব নিয়ে। আমাকে আপনার ভালো লাগে কি না। হয়তো এবিষয়ে আপনার কোনো চেতনাই নেই। না জানি কি উত্তর দেবেন, কিন্তু প্রশ্ন যে আমায় করতেই হবে। আমার আগের চিঠিতে নিজের সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে, আমি "উপযাচিকা," আর এ চিঠিতে লিখলাম মাঝবয়েসী রমণীর আকুলতার কথা। এখন মনে হচ্ছে আপনার জবাব না পেলে এই আকুলতাও ভিত্তিহীন হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। অবশিষ্ট অভিশপ্ত জীবন নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটবে। আপনার জবাব না পেলে আমি শেষ হয়ে যাবো।

আপনার উপন্যাসে প্রায়ই দুঃসাহসিক প্রেমের বর্ণনা থাকে আর লোকে এমনভাবে আপনার সম্পর্কে বলাবলি করে যেন আপনি এক হৃদয়হীন দানব। আমার কিন্তু হঠাৎ মনে হলো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ওপরই আপনার আস্থা বেশি। ব্যক্তিগত ভাবে কাণ্ডজ্ঞান আমার কাছে অর্থহীন। আমার মতে, ইচ্ছে অনুযায়ী বাঁচতে পারার নামই সৎ জীবন। আমি চাই আপনার সন্তানের জননী হতে। যা খুশি ঘটুক না কেন, আর কারোর সন্তান নয়। এখন শুধু আপনার উপদেশের অপেক্ষা, এর উত্তর জানা থাকলে আমায় জানিয়ে বাধিত করবেন। সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় আপনার মনের হদিশ দেবেন।

বৃষ্টি থেমে হাওয়া উঠেছে। এখন বেলা তিনটে। এবার আমি আমাদের বরাদ্দ সবচেয়ে ভালো মদের সন্ধানে বেরুবো। দুটো 'শূন্যগর্ভ 'রাম'-এর বোতল একটা থলিতে পুরে এবং এই চিঠিখানা নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গ্রামের পথে পাড়ি দেবো। এই মদ আমার ভাইয়ের নাগালের বাইরে নিজের জন্য সরিয়ে রাখবো। প্রতিরাত্রে গেলাসে ঢেলে একটু-একটু মদ খাই। জানেন বোধহয় 'সাকে' গেলাসে খাওয়াই রেওয়াজ।

একবার এখানে আসুন না?

মিস্টার এম, সি, সমীপেষু।

আজ আবার বৃষ্টি হয়ে গেলো। কুয়াশা আর বৃষ্টি মিশে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। রোজ আপনার উত্তরের আশায় থাকি, বাড়ির বাইরে যেতে ভরসা হয় না। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই এলো না। কি ভাবছেন? জানি না এর আগের চিঠিতে শিল্পীর বিষয় লিখে ভুল করলাম কিনা। বোধহয় ভেবেছেন আপনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগানোর জন্যই ঐ প্রস্তাবের কথা লিখেছি।

কিন্তু তারপর থেকে ব্যাপারটা ধামাচাপাই পড়ে গেছে। এই তো খানিক আগেই মা আর আমি সেই কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম। কিছুদিন হলো মা জিভের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু নাওজির শৌখিন চিকিৎসার কল্যাণে ব্যথাটা কমেছে এবং সম্প্রতি শরীর একরকম ভালোই আছে। কয়েক মিনিট আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কেমন করে হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টিধারা উড়ে ঘুরে মরছে আর সেই সঙ্গে আপনার মনের হদিশ পাবার চেষ্টা করছিলাম এমন সময়ে খাবার ঘর থেকে মায়ের ডাক কানে এলো, "দুধ জ্বাল দিয়েছি, এদিকে এসো।"

মা বললেন, "দারুণ ঠাণ্ডা দেখে দুধ একটু বেশিই গরম করলাম।"

ধোঁয়া ওঠা দুধে চুমুক দিতে-দিতে শিল্পীর প্রসঙ্গ উঠলো। আমি বললাম, "তাঁর সঙ্গে আমার মিলতেই পারে না, কি বলো মা ?"

শান্তস্বরে মা জবাব দিলেন, "না তোমার সঙ্গে নয়।"

"একে তো আমি বেয়াড়া মেয়ে, তাছাড়া শিল্পীদের ওপরও আমার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। এদিকে ভদ্রলোকের রোজগারও ভালো, সবদিক দিয়ে বিচার করলে সম্বন্ধটা নেহাৎ নিন্দের নয়। কিন্তু তবু অসম্ভব।"

মা মুচকি হেসে বললেন, "কাজুকো তুমি ভারী দুষ্টু। যদি অসম্ভবই জানতে তবে কেন সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে অতো খোশগল্প জুড়ে দিলে ? তোমার মতিগতি বোঝা দায়।"

"বাঃ কথা বলতে মজা লাগছিল যে। আরও অনেক গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। তুমি তো জানো কথা কওয়ার লোক পেলে আমার জ্ঞান থাকে না।"

"না, কাউকে পেলে গল্প জুড়ে দেওয়াই তোমার স্বভাব। কাজুকো তুমি বড়ো নাছোড়বান্দা।"

আজ মায়ের মেজাজটা খুব ভালো। গতকাল আমি প্রথমবার চুল চুড়ো করে বেঁধেছিলাম। সেদিকে চোখ পড়তে বললেন, "যাদের চুল কম তারা এইরকম করে চুল বাঁধে। তোমার মাথায় এই চুড়ো অসম্ভব জমকালো দেখাচ্ছে। একখানা ছোট্টো সোনার টায়রা হলেই মানাতো ভালো। এমন করে না বাঁধলেই পারতে।"

"মা, তুমি আমায় নিরাশ করলে। একবার তুমিই তো বলেছিলে যে, আমার এতো সুন্দর ঘাড় ঢেকে রাখার কোনো মানে হয় না। বলোনি ?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই কিছু একটা বলেছিলাম বলে যেন মনে পড়ছে।"

"আমার কেউ প্রশংসা করলে তার একটা কথাও আমি ভুলি না। তোমার মনে আছে দেখে খুব খুশি হলাম।"

"সেদিন সেই ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার প্রশংসা করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, তা করেছিলেন। সেইজন্যই তো তাঁকে অতো সহজে হাত ছাড়া করতে চাইনি। তিনি বলছিলেন যে, আমি তাঁর পাশে থাকলে তিনি আবার নতুন করে কাজে উৎসাহ পাবেন—না আর বেশি বলবো না। আমি যে শিল্পী পছন্দ করি না তা নয়, তবে চরিত্রবান পুরুষ বলে যে হামবড়াই করে, তাকে আমার অসহ্য লাগে।"

" নাওজির গুরু মশাইটি কেমন ?"

আমার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো।

" ঠিক বলতে পারি না, তবে নাওজির গুরুর দৌড় আর কত হবে? ভদ্রলোকের গায়ে 'অনাচারী' লেখা তকমা যেন ঝুলছে।"

"তকমা ?" মায়ের চোখে কৌতুকের ছায়া খেলে গেলো, "ভারী মজার কথা তো। তকমাই যদি রইলো তবে তো সে নির্দোষ। এ যেন গলায় ঘণ্টা বাঁধা বেড়ালের মতোই মিষ্টি শোনাচ্ছে। তকমাহীন লম্পটকেই তো ভয় বেশি "

" কি জানি।"

আমার এতো ভালো লাগছিল, এতো খুশি হয়েছিলাম আমি। মনে হলো দেহটা ধোঁয়ার মতো হাল্কা হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। বুঝছেন ব্যাপারটা? কিসে আমার আনন্দ এ যদি আপনি না বোঝেন, তবে আমি আপনাকে আঘাত দিয়ে বোঝাবো।

আপনি কি কখনও এখানে আসবেন না? আমি নাওজিকে বলতাম আপনাকে ধরে আনতে। কিন্তু তাকে বলা কেমন যেন অস্বাভাবিক আর অদ্ভুত শোনায় না? সবচেয়ে ভালো হতো হঠাৎ যদি আপনি এখানে উপস্থিত হতেন, যেন এও আপনার একটা খেয়ালের ব্যাপার। নাওজির সঙ্গে এলেও ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু নাওজি টোকিওতে থাকতে থাকতে আপনি একা চলে এলেই ভালো হতো। এখানে থাকলে নাওজি আপনাকে দখল করে বসবে, আপনাকে ওসাকির ওখানে মদ খাওয়াতে নিয়ে যাবে, ব্যস তাহলেই সব মাটি।

বংশানুক্রমে আমাদের পরিবারের শিল্পী-প্রীতি বর্তমান। কিওটোতে আমাদের ভিটে-বাড়িতে কুরিন বহু বছর কাটিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। সুতরাং আপনি এলে মা খুব খুশি হবেন আমি জানি। ওপর তলায় বিদেশী-কেতায় সাজানো ঘরটায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। দয়া করে আলো নেবাতে ভুলবেন না। মোমবাতি হাতে আমি অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবো। পছন্দ হলো না? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

অনাচারী মানুষ আমি ভালোবাসি, বিশেষত যাদের নামের সঙ্গে কলঙ্ক জড়ানো আছে। আমি নিজেও অনাচারী হতে চাই। আমার বিশ্বাস, এছাড়া বাঁচবার আর কোনো রাস্তা আমার নেই। সারা জাপানের মধ্যে আপনি লাম্পট্যের উদাহরণস্বরূপ। নাওজির মুখে শুনেছি লোকের ধারণা আপনি অত্যন্ত নোংরা কদাকার, সবাই আপনাকে ঘৃণা করে এবং মাঝে মাঝে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। এসব শুনে আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আপনার মতো ব্যক্তির গুণগ্রাহী ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু এখন থেকে আপনি শুধু আমাকেই ভালোবাসবেন। এছাড়া আমি ভাবতে পারি না। আমার সঙ্গে থাকলে কাজেও আপনি নতুন স্বাদ পাবেন। ছেলেবেলা থেকে অনেক মুখেই শুনেছি আমার সঙ্গ মানুষকে তার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। জীবনে কেউ কোনোদিন আমায় অপছন্দ করেনি। প্রত্যেকে একমুখে বলেছে চমৎকার মেয়ে। এই কারণেই মনে হয় আমায় অপছন্দ করার সাধ্য আপনার নেই।

একবার আপনার দেখা পেলে কি ভালোই না হতো। আর আমার চিঠির উত্তর বা কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি দেখা করতে চাই। সবচেয়ে ভালো হতো যদি আপনার টোকিওর বাসায় গিয়ে দেখা করতে পারতাম। কিন্তু মায়ের দেখাশোনা শুধু আমাকেই করতে হয়, কাজেই তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পায়ে পড়ি, একবার এখানে আসুন। শুধু একবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার বিশেষ দরকার। তখনই আপনি আমার সব কথা বুঝতে পারবেন। অধরপ্রান্তে অস্পষ্ট রেখাগুলি নজর করে দেখবেন। শতাব্দীর অভিশাপবাহী বলিরেখাগুলি দেখে যান, ভাষার চেয়ে মুখের ভাবে আমার মনের অবস্থা অনেক বেশি বুঝতে পারবেন।

প্রথম চিঠিতে আমার হৃদয়ে এক বিচিত্র রামধনুর কথা লিখেছিলাম। জোনাকির ক্ষীণ আলো অথবা সুদূর দিগন্তের নক্ষত্ররাজির আলোকসজ্জাতে সেই রামধনু গঠিত হয়নি। তেমন অস্পষ্ট অথবা সুদূর হলে আমার এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না এবং হয়তো কালে কালে আপনাকে ভুলেও যেতাম। আমার হৃদয়ে এই রামধনু অগ্নিশিখায় রচিত। এতো তীব্র এই অনুভূতি যে তা অনুক্ষণ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করে। আফিং ফুরিয়ে গেলে আফিংখোর যে যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরে তাও বোধহয় এতো অসহ্য নয়। আমি নিশ্চিত জানি এ আমার ভুল নয়, কোনো অন্যায়ও আমি করছি না; কিন্তু মাঝে-মাঝে নিজের মনের তাড়নায় নিজেই চমকে উঠি, এ আমি কি অসম্ভব নির্বোধের মতো কাজ করতে চলেছি। প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি, হয়তো আমি পাগল হয়ে গেছি। যাই হোক এখনও মাঝে-মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজের কথা ভাবতে পারি। দয়া করে একবার এখানে আসুন, যে কোনো সময়ে এলেই হবে, এখানে আপনার প্রতীক্ষা করে বসে থাকবো, কোথাও যাবো না। দয়া করে আমায় বিশ্বাস করুন।

আর একবার শুধু আমায় দেখে যান, তারপরেও যদি আমায় অপছন্দ হয় স্বচ্ছন্দে জানাতে পারেন। আপনার নিজের হাতে জ্বালা আমার অন্তরের এই বহ্নিশিখা আপনি স্বেচ্ছায় নিবিয়ে দিতে পারেন। নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টায় এ শিখা নির্বাপিত করা অসম্ভব। আমি জানি আমাদের সাক্ষাৎ হলে, শুধু মাত্র সাক্ষাৎ হলেই আমি বেঁচে যাবো। হায়! যদি সেই "গেনজির উপাখ্যানে"-র দিনগুলি ফিরে পাওয়া যেতো, তাহলে আমার এখনকার চাওয়া মোটেই অসম্ভব শোনাতো না, কিন্তু আজ আপনার রক্ষিতা হতে, আপনার সন্তানের জননী হতে আমার কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

আমার এ চিঠিগুলো পড়ে যদি কেউ হাসে, তবে বুঝতে হবে যে সে ব্যক্তি নারীর বেঁচে থাকার প্রচণ্ড প্রয়াসকে, নারী-জীবনকে ব্যঙ্গ করছে। জাহাজ ঘাটের চাপা হাওয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মন চায় উন্মুক্ত সাগর বক্ষে পাল তুলে ভেসে যাবে—ঝড় আসে আসুক তাতে ক্ষতি নেই। গোটানো পাল অপরিষ্কার হতে বাধ্য। আমায় ব্যঙ্গ যারা করে তারা গোটানো পালের মতোই অপরিচ্ছন্ন। তাদের সাধ্য কি ভালো কিছু করার?

নারী-জীবনের কলঙ্ক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমিই শুধু ভুক্তভোগী। "কী যাতনা

বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" আলস্তভরে অপরিষ্কার পাল নামানোর মতো বাইরে থেকে আমার কাজের সমালোচনা করার অপচেষ্টা অর্থহীন। আমার চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব, অপরের ঘাড়ে তুলে দেবার স্পৃহা আমার আদৌ নেই। চিন্তার ধার আমি ধারি না। জীবনে কোনো মতবাদ বা দর্শনের ভিত্তিতে কোনো কাজ আমি করিনি।

আমার বিশ্বাস দুনিয়া যাদের ভালো বলে, শ্রদ্ধা করে, তারা সবাই মিথ্যেবাদী, ভণ্ড। এ দুনিয়ার ওপর আমার আদৌ আস্থা নেই। আমার একমাত্র সুহৃদ হচ্ছে পরিচিত এক ব্যভিচারী পুরুষ। তকমাধারী ব্যভিচারী। একমাত্র সেই ক্রুশের ওপরই আমি আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। দশ হাজারজন লোক আমার সমালোচনা করলেও আমি তাদের মুখের ওপর এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারি, "পাপের স্বরূপ গোপন রাখা আরও অনেক বেশি মারাত্মক নয় কি ?"

বুঝলেন কিছু ?

প্রেম অর্থহীন এবং তার আপাত যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে গিয়ে আমি যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে আমার ভাইয়ের বুলিই পাখিপড়ার মতো আউড়ে গেছি এতক্ষণ। আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, আমি আপনার পথ চেয়ে রইলাম আবার আপনাকে দেখতে চাই আমি। ব্যস এই পর্যন্ত।

শুধু অপেক্ষা করে থাকা। জীবন সুখ, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি বহু আবেগে পরিপূর্ণ, কিন্তু জীবনের মাত্র একভাগ সময় এদের নিয়ে কাটে, বাকি নিরানব্বই ভাগই আশায়-আশায় কেটে যায়। সেই পরম ক্ষণটির অপেক্ষা করে আছি। মনে হয় বাঞ্ছিতের পদধ্বনিতে বুকের ভেতরটা দলিত, নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। সব। শূন্য ! হায় জীবন কী যন্ত্রণা ! না জন্মানোই সবচেয়ে ভালো ছিলো—এই চিরন্তন সত্য বাস্তবের ভেতর দিয়ে বারবার প্রমাণিত হয়ে আসছে।

এইভাবে প্রত্যহ সকাল থেকে রাত অবধি পথ চেয়ে-চেয়ে নিরাশ হই। মনে-মনে ভাবি এই যে জন্মেছি, বেঁচে আছি, মানব জীবন আছে, দুনিয়া আজও টিকে আছে—এই নিয়েই যদি সুখী হতে পারতাম।

নীতির অনুশাসন কি আপনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন না ? এম, সি। (মাই শেখভের আত্মক্ষর নয়। সাহিত্যিকের প্রেমে আমি পড়িনি। আমার সন্তান)।

পঞ্চম অধ্যায় | মহিলা

এই গ্রীষ্মে আমি তাঁকে তিনখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। সে সময়ে মনে হয়েছিল এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই এবং আমার হৃদয় উজাড় করে চিঠিগুলিতে ঢেলে দিয়েছিলাম। নিস্তরঙ্গ অন্তরীপ ছেড়ে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো দোদুল্যমান অবস্থায় চিঠিগুলি ডাকে দি। কিন্তু বহুকাল অপেক্ষা করেও কোনো জবাব পেলাম না।

একবার আমি কথায়-কথায় নাওজিকে জিগগেস করলাম, ভদ্রলোক কেমন আছেন। নাওজি জবাব দিল, যেমন চিরকাল থাকেন তেমনি আছেন। প্রতিরাত্রে মদ আর আনুষঙ্গিক হৈ-হল্লার মধ্যে কাটে, লিখছেনও আরো বেশি অশ্লীল—সমস্ত সভ্যসমাজ তাঁকে সবসময়ে ছি ছি করে। উপরন্তু তিনি নাওজিকে পুস্তক-প্রকাশনায় নাবতে বলেছেন এবং সেও এই প্রস্তাব মহা-উৎসাহে গ্রহণ করেছে। গোড়াপত্তন হিসেবে নাওজি এ ভদ্রলোক ছাড়া আরও দুজন সাহিত্যিককে ব'লে-ক'য়ে তাঁদের বইয়ের এজেণ্ট হয়েছে। এখন মূলধন জোগাবার মতো কাউকে ধরা যায় কিনা এই হলো সমস্যা। নাওজির কথা শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, আমার মনের এক কণা সুরভিও পারিপার্শ্বিকতা ভেদ করে আমার ভালোবাসার মানুষটির কাছে পৌঁছোয়নি। এর জন্য লজ্জা যতো না পেলাম, তার চেয়েও বেশি করে বুঝলাম যে বাস্তব জগতের সঙ্গে আমার কল্পনার অনেক তফাৎ। অননুভূত এক নৈঃসঙ্গ্য আমাকে ছেয়ে ফেললো, মনে হলো হেমন্তের কোনো সন্ধ্যায় এক পতিত প্রান্তরে আমি পরিত্যক্তা। ডাকলেও কেউ সাড়া দেবে না। অবাক হয়ে ভাবি একেই কি চলতি ভাষায় "ব্যর্থ প্রেম" বলে? নিজের মনে প্রশ্ন করি, সূর্যদেব দৃষ্টির সম্পূর্ণ

অন্তরালে সরে যাবার পর একাকী বিজন প্রান্তরে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে মৃত্যুই কি আমার নিয়তি? আমার কাঁধ দুটো আর বুক থরথর করে কেঁপে উঠলো, চাপা কান্নায় দম বন্ধ হয়ে এলো।

এরপর টোকিওতে গিয়ে মিঃ উয়েহারার সঙ্গে দেখা করা ভিন্ন কোনো গত্যন্তর রইলো না—ক্ষতি যা হবার হোক, আমি পাল উড়িয়ে দিয়েছি—তরী আমার ঘাট ছেড়ে অকূলে ভাসলো। আর অপেক্ষা করতে পারি না। যেখানে যাবার সেখানে আমায় যেতেই হবে। টোকিও যাত্রার গোপন আয়োজন করার সময়ে এই কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ভাসছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ মায়ের অবস্থা ঘুরে গেলো।

একদিন রাত্তিরে মা দারুণ কাশতে লাগলেন। শরীরের তাপ নিয়ে দেখি একশো দু ডিগ্রি।

কাশির ধমকের ফাঁকে মা বললেন, "খুব সম্ভব আজকের এই ঠাণ্ডাটা লেগেছে, কাল ভালো হয়ে যাবে।" যাই হোক শুধু কাশি বলে মনে হলো না, নিশ্চিন্ত হবার জন্য পরদিন সকালে গ্রামের ডাক্তারকে ডেকে আনবো ঠিক করলাম।

পরদিন সকালে মায়ের শরীরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এলো, সঙ্গে-সঙ্গে কাশিও কমলো। যাই হোক আমি ডাক্তারকে গিয়ে মাকে একবার দেখে যেতে অনুরোধ করলাম এবং সেই সঙ্গে মায়ের সাম্প্রতিক দুর্বলতার কথা, গতরাত্রের জ্বরের কথা এবং কাশির পেছনে ঠাণ্ডা ছাড়াও আরও কিছু আছে, আমার এই অনুমানের কথা সব তাকে জানালাম।

"আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি"—বলে ডাক্তার আমায় ভরসা দিলেন, তারপর বললেন "তোমার জন্য একটা জিনিস আছে।" বাইরে ঘরের তাকের ওপর থেকে তিনখানা ন্যাসপাতি এনে আমায় দিলেন। পরিপাটি পোশাক পরে দুপুর গড়াবার খানিক পরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। প্রতিবারের মতো এবারেও অনেকক্ষণ ধরে মাকে

পরীক্ষা করলেন। বুক-পিঠ ঠুকে-ঠুকে কান পেতে শব্দ শুনে শেষে আমার দিকে ফিরে বললেন, "না ভয় পাবার মতো কিছু নয়। আমার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খেলেই ভালো হয়ে উঠবেন।"

ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি দেখে হাসি চেপে রাখা দায়। কোনোমতে জিগগেস করলাম, "ইনজেকশন দেবেন না ?"

গম্ভীরভাবে তিনি উত্তর দিলেন, "তার বোধহয় দরকার হবে না। ঠাণ্ডা লেগেছে, চুপচাপ শুয়ে থাকলে সেরে উঠবেন।"

কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেল, তবু মায়ের জ্বর গেলো না। কাশি কমলো বটে, কিন্তু জ্বর সকালে নিরানব্বুই ডিগ্রি এবং রাত্রে একশো দু ডিগ্রির মধ্যে ওঠা-নামা করে। ঠিক এই সময়ে পেটের অসুখ হয়ে ডাক্তার শয্যা নিলেন। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে নার্সের কাছে মায়ের অবস্থার কথা বললাম, সে গিয়ে আমার কথাগুলো ডাক্তারকে জানালো। তাঁর কাছ থেকে উত্তর এলো, "সামান্য সর্দি-কাশির ব্যাপার, ঘাবড়াবার কি আছে ?" এক শিশি মিক্‌সচার আর পাউডার নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

নাওজি স্বভাবতই টোকিওতে আছে। দশদিনের ওপর সে গেছে। একা ভীষণ ঘাবড়ে আমি ওয়াদামামাকে মায়ের খবর দিয়ে চিঠি লিখলাম।

দিন কয়েক পরে আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার এসে জানালেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর পেটের অসুখ সেরে গেছে।

খুব মন দিয়ে মায়ের বুক পরীক্ষা করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "আঃ এতক্ষণে বোঝা গেলো। এইবার ঠিক ধরেছি।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "জ্বরের কারণ ধরা পড়ে গেছে। বাঁদিকের ফুসফুসটা জখম হয়েছে যাই হোক, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। জ্বর এখন কিছুদিন থাকবে, কিন্তু তোমার মা যদি চুপ করে শুয়ে থাকেন, তবে ভয়ের সত্যি কোনো কারণ নেই।"

মনে মনে ভাবলাম, "কে জানে।" কিন্তু ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে ভাসতে চায় তেমনি ডাক্তারের কথায় যেটুকু আশ্বাস পাওয়া যায় তাই সই।

ডাক্তার চলে গেলে আমি খুশির ভান করলাম, "মা এতোদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো, কি বলো? সামান্য একটু শ্লেষ্মা জমেছে। এ তো বেশির ভাগ লোকেরই থাকে, মনটাকে যদি তুমি শক্ত করতে পারো, তবে দেখতে-দেখতে সেরে উঠবে। এবারের গরমকালের আবহাওয়াটা এমন বেখাপ্পা! তাইতো মুস্কিল হলো। গ্রীষ্মকালটা আমার দুচোখের বিষ, গরমের ফুলগুলোও তাই।"

চোখ বন্ধ করেই মা হাসলেন, "লোকে বলে যারা গ্রীষ্মের ফুল ভালোবাসে তারা গরমেই মারা যায়। আমি এই গ্রীষ্মেই শেষনিশ্বাস ফেলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু নাওজি বাড়ি ফিরে এসেছে বলেই বোধহয় শরৎকাল পর্যন্ত টিকে আছি।"

নাওজির মতো এখন অপদার্থই আজ মায়ের চোখের মণি হয়ে দাঁড়ালো ভেবে মনে ব্যথা পেলাম।

"বেশ সেই গ্রীষ্মই যখন পেরিয়ে এলে, তবে তোমার ফাঁড়াও বোধহয় কেটে গেলো, তাই না? বাগানে লবঙ্গ ফুল ফুটেছে তাছাড়া ভ্যালেরিয়ন বার্নেট বেল ফ্লাওয়ার, টিমোথি—সবাই মিলে বাগানে যেন শরতের বান ডেকে এনেছে! আমার মন বলছে অক্টোবর মাস পড়তেই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।"

প্রাণপণে ভগবানকে ডাকি, তাই যেন হয়। সেপ্টেম্বরের চটচটে একঘেয়ে দিনগুলো গেলে বাঁচি। তারপর যখন ক্রিসানথিমাম্ ফুটবে, ভারতীয় গ্রীষ্মের মতো একটার পর একটা ঝলমলে দিন আসবে মা তখন নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন। মা একটু জোর পেলেই, আমি যাবো অভিসারে! হয়তো মস্ত এক ক্রিসান্থিমামের মতো আমার আশাও পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। হায়!

অক্টোবর মাসটা যদি এগিয়ে আসতো আর সেই সঙ্গে যদি মা'ও সেরে উঠতেন।

মামাকে চিঠি লেখার পর প্রায় এক সপ্তাহ বাদে মামা একদা রাজবৈদ্য প্রবীণ ডাক্তার মিয়াকিকে টোকিও থেকে এনে দেখাবার ব্যবস্থা করলো।

ডাক্তার মিয়াকি বাবার পরিচিত ছিলেন। তাঁকে দেখে মা খুশি হলেন বোঝা গেলো। তাঁর অমার্জিত ব্যবহার আর রুক্ষ ভাষা, যার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, মায়ের মন গলিয়ে দিলো। বুক-পিঠ পরীক্ষা না করে ভদ্রলোক মায়ের সঙ্গে অবাধ পরচর্চায় মেতে গেলেন। পুডিং রান্না সেরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি মাকে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। তাঁর গলায় কণ্ঠহারের মতো স্টেথিসকোপ ঝুলছে।

"আমার মতো লোক রাস্তার ধারে এঁদো হোটেলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নুডল্ খেয়ে লাঞ্চপর্ব সারে। তোমরা কখনও সেরকম অপূর্ব সব খাদ্য, অর্থাৎ বাজে জিনিস খাওনি।" ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে এই কথা কানে এলো, আর এই ছিলো তাঁদের আলোচনার ধরন। মা একমনে তাঁর কথা শুনছিলেন।

মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, "তাহলে মায়ের অসুখটা বোধহয় বিশেষ কিছু নয়!" হঠাৎ মনের মধ্যে জোর পেয়ে প্রশ্ন করলাম, "মাকে কেমন দেখলেন? গাঁয়ের ডাক্তার বলে গেলো বাঁদিকের ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমেছে। আপনি কি বলেন?"

নির্বিকার মুখে ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "সে আবার কি? তোমার মার কিছু হয়নি।"

"আঃ বাঁচা গেলো! মনটা হালকা হলো না মা?" মন থেকে খুশি হয়ে হেসে উঠলাম, "শুনেছো মা? উনি বলছেন তোমার কিছুই হয়নি।" এরপর ডাক্তার মিয়াকি চেয়ার ছেড়ে উঠে চীনা-ঘরের

দিকে এগিয়ে গেলেন। নিশ্চয় আমায় কিছু বলতে চান। তাঁর পেছন-পেছন পা টিপে-টিপে বেরিয়ে গেলাম।

" দেওয়াল ঢাকা পর্দা অবধি গিয়ে উনি থামলেন। বললেন, অদ্ভুত একটা শব্দ পাচ্ছি বুকে।"

" ফুসফুসে জল হয়নি তো ?"

"না।"

"তবে ব্রঙ্কাইটিস ?" ছলোছলো চোখে জিগগেস করলাম।

"না।"

টি, বি, কথাটা আমি জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস এমন কি ফুসফুসে জল হলেও মাকে আমি এ যাত্রা টেনে তুলতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার ছিলো। কিন্তু এ যে রাজরোগ—বোধহয় অনেকটাই দেরি হয়ে গেলো। মনে হলো পা দুটোয় দাঁড়াবার মতো জোর পাচ্ছি না।

আমি অসহায়ভাবে কাঁদতে-কাঁদতে জিগগেস করলাম, "আপনি যে অদ্ভুত আওয়াজের কথা বললেন সেটা কি খুব খারাপ ?"

"ডান বাঁ দুদিকের সবটুকু ছেয়ে গেছে।"

" কিন্তু মাকে তো এখনও দিব্যি সুস্থ দেখায়। কেমন তৃপ্তির সঙ্গে খান।"

" তাহলেও কোনো উপায় নেই মা।" "এ সত্যি নয়, এ হতেই পারে না। মাকে যদি প্রচুর পরিমাণে মাখন, ডিম, দুধ খাওয়াই তবে নিশ্চয় সেরে উঠবেন, তাই না ? যে-পর্যন্ত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আছে ততোদিনে, তাঁর জ্বর ছেড়ে যেতে বাধ্য, কি বলেন ?"

"তাঁর যা প্রাণে চায় তাই প্রচুর পরিমাণে তাঁকে খেতে দেবে।"
"আমি তো তাই বলছি এতক্ষণ। দিনে মা পাঁচটা টোমাটো খান।"

" টোমাটো ভালো জিনিস বৈকি।"

" তাহলে ভাবনার কিছু নেই তো ? মা সেরে উঠবেন ?"

"এ রোগ মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তোমার আগে থেকে জানা ভালো।"

জীবনে আজ প্রথম জানলাম যে, দুনিয়াতে এমন কতকগুলি নৈরাশ্যের প্রাচীর রয়েছে যাদের সমবেত শক্তির কাছে মানুষ অসহায়।

"দু বছর? তিন বছর?" কাঁপা গলায় ফিসফিস করে জিগগেস করলাম।

"বলা যায় না। মোটকথা কোনো উপায় নেই।"

"নাগওয়া উষ্ণ প্রস্রবণে যাবার জন্য ব্যবস্থা করা আছে," এ ধরনের কি যেন বিড়বিড় করতে-করতে ডাক্তার মিয়াকি চলে গেলেন। আমি ফটক অবধি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর আচ্ছন্নের মতো মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালাম। যেন কিছু হয়নি, মুখে এমনি একটা হাসি টেনে আনলাম, কিন্তু মা জিগগেস করলেন, "ডাক্তারবাবু কি বলে গেলেন?"

তিনি বললেন, "তোমার জ্বরটা ছেড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"বুকের কথা কি বললেন?"

"বোধহয় ওটা তেমন কিছু নয়। তুমি এর আগে একবার যেমন ভুগেছিলে তেমনি কিছু একটা হবে। আমি জানি ঠাণ্ডাটা একবার পড়ে গেলেই তুমি ঝেড়ে উঠবে।"

নিজের মিথ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইলাম। ঐ নিদারুণ "মারাত্মক" শব্দটা ভুলে থাকতে চাইলাম। মনে হলো মা মারা গেলে আমার শরীর থেকে সব মাংস গ'লে-প'চে বেরিয়ে যাবে। মনে মনে স্থির করলাম এখন থেকে মায়ের জন্য সবরকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করাই হবে আমার সাধনা। মাছ, সুপ, মেটে, শুরুয়া, টোমাটো, ডিম, দুধ, স্যালাড্—মায়ের জন্য খাবার জিনিস কিনতে আমার যা আছে সব বেচে দেবো।

চীনেঘর থেকে আরাম চেয়ারটা বারান্দায় টেনে এমন জায়গায় পাতলাম, যেখান থেকে মাকে স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁর চোখে-মুখে অসুস্থতার লেশমাত্র নেই। চোখ দুটি উজ্জ্বল, গায়ের ত্বক সতেজ, মসৃণ। জ্বরটা আসে ঠিক বিকেলের মুখে।

মনে মনে ভাবলাম, "আমার মা কী সুন্দর দেখতে!" আমি ঠিক জানি মা আবার ভালো হয়ে উঠবেন। মন থেকে ডাক্তার মিয়াকির রোগ-নির্ণয়ের কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম।

কল্পনায় আঁকছিলাম অক্টোবরের ছবি, যখন ক্রিসানথিমাম ফুটবে। ঘুমের মধ্যে কখন যে এক নৈসর্গিক পটভূমিতে নেমে এসেছি টের পাইনি। স্বপ্নে আমার এ জায়গার সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু বাস্তবে কখনও এমন জায়গায় যাইনি। যেন আমি বনের মধ্যে বহুদিনের চেনা এক হ্রদের ধারে পৌঁছে পরিচিত স্থানটি দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। জাপানী পোশাক-পরা এক ছেলের পাশে-পাশে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। সারা দৃশ্যপটটি সবুজ কুয়াশায় ঢাকা, পলকা এক শাদা সাঁকো জলের তলায় ডুবে আছে।

ছেলেটি বললে, "পুলটা ডুবে গেছে, আজ আর আমাদের কোথাও যাওয়া হবে না। এসো এখানে হোটেলে গিয়ে উঠি। নিশ্চয়ই একখানা খালি ঘর পাওয়া যাবে।"

হ্রদের ধারে একটা হোটেল। তার পাথরের দেওয়ালগুলো সবুজ কুয়াশাচ্ছন্ন। পাথরের ফটকের গায়ে সোনার জলে লেখা রয়েছে, "হোটেল সুইজ্যারল্যাণ্ড।" এস্ ডব্লিউ আই অবধি পড়ে হঠাৎ মায়ের কথা মনে হলো। না জানি কেমন আছেন, তিনিও এই হোটেলেই আছেন কিনা কে জানে—এ কথা মনে হতে অস্বস্তি বোধ করলাম। সেই যুবকের সঙ্গে ফটক পেরিয়ে সামনে বাগানে ঢুকে পড়লাম। হাইড্রেনজিয়ার মতো মস্ত মস্ত লাল ফুলগুলো ধোঁয়াটে বাগান আলো করে আছে। ছেলেবেলায় আমার

বিছানা-ঢাকা চাদরের ওপর টুকটুকে লাল রঙের সুতো দিয়ে হাইড্রেনজিয়ার প্যাটার্ন তোলা ছিলো। সেগুলো দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেতো। কিন্তু এখন মনে হলো লাল হাইড্রেনজিয়া ফুল বলতে সত্যি কিছু আছে।

"তোমার শীত করছে না তো?"

"সামান্য", আমার কান দুটো কুয়াশায় ভিজে উঠেছে আর শরীরের ভেতরটা জমে যাচ্ছে। হাসতে-হাসতে ওকেই প্রশ্ন করলাম, "মা কেমন আছেন কে জানে?"

ছেলেটির ম্লান হাসির মধ্যে বিষাদ ও সহানুভূতির ছায়া।

"তিনি তো কবরে।"

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। তাহলে তাই। মা আর নেই। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেছে কি? মায়ের মৃত্যুর এই দুঃস্বপ্নে ভাষাতীত নিঃসঙ্গতায় আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, ঘুম ভেঙে গেলো।

এতক্ষণে গোধূলির শেষ আলো অন্ধকার বারান্দায় নেমে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে। প্রতিটি জিনিসে আমার স্বপ্নে দেখা আবছা সবুজের ছোঁয়া।

আমি ডাকলাম, "মা!"

শান্তস্বরে মা জবাব দিলেন, "কি করছো ওখানে?"

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে মার পাশে গিয়ে হাজির হলাম, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা।"

"আমি এতক্ষণ ভেবে মরছি, না জানি তুমি কি কাজে ব্যস্ত! টানা ঘুম দিয়ে নিলে না?" মা আমার অবস্থা দেখে কৌতুক বোধ করলেন।

মায়ের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম, তিনি যে বেঁচে আছেন এরজন্য কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এলো।

দুষ্টুমি করে জিগগেস করলাম, "নৈশভোজের জন্য কি আদেশ করেন রানীমা?"

"কিছু ভেবো না, আজ আর কিছু খাবো না, জ্বর একশো তিন ডিগ্রি উঠেছিলো।"

আনন্দের ভেতর থেকে কে যেন আমায় নিরাশার অন্ধকারে ছুঁড়ে দিলো। কি করবো ভেবে না পেয়ে ঘরের আধো অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে নিলাম। মরে যেতে ইচ্ছে হলো।

"কেন হলো বুঝতে পারছি না তো! একশো তিন ডিগ্রি!"

"ও কিছু নয়। জ্বর আসার মুখে একটু কষ্ট হয়, মাথা ব্যথা করে, শীত-শীত ভাব হয়, তারপরেই জ্বরটা আসে।"

বাইরে এতক্ষণ আঁধার নেমেছে। বৃষ্টি ধ'রে গেছে, কিন্তু বেশ হাওয়া রয়েছে। আলোটা জ্বেলে দিয়ে খাবার ঘরে যাবার মুখে মায়ের ডাক কানে এলো, "আলোটা বড্ডো চোখে লাগছে, নিবিয়ে দাও তো মা।"

"কিন্তু এই অন্ধকারে একা শুয়ে থাকতে ভালো লাগবে?" সুইচের কাছে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম।

"তাতে কি? ঘুমোলে চোখ তো বন্ধই থাকে। অন্ধকারে আমার একটুও একা মনে হয় না। আলোর ঐ তেজ মোটে সহ্য করতে পারি না। এখন থেকে এ-ঘরে আর আলো জ্বেলো না, কেমন?"

মায়ের কথায় বুকের ভেতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। আর কথা না ব'লে বাতি নিবিয়ে দিলাম। পাশের ঘরে একটা বাতি জ্বাললাম। একা-একা অসহ্য মনে হওয়ায় রান্নাঘরের দিকে চলে গেলাম। সেখানে ঠাণ্ডা ভাতের সঙ্গে টিনের সালমন মাছ খেতে ব'সে দুচোখ দিয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়লো।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের জোর বেড়ে গেলো এবং রাত নয়টা আন্দাজ প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে অঝোরে বৃষ্টি নামলো। বারান্দার জানলার পাখিগুলো দিন দুই আগে আমি গুটিয়ে তুলেছিলাম, সেগুলো বাতাসে খট্‌খট্‌ আওয়াজ করছিলো। মায়ের পাশের ঘরে

অদ্ভুত এক উত্তেজনা নিয়ে রোজা লুক্সেমবার্গের "অর্থনীতির ভূমিকা" পড়তে বসলাম। নাগুজির ঘর থেকে বইখানা ধার ক'রে এনেছি (সে অবশ্য একথা জানে না) এবং কাউটস্কির সমাজ-বিপ্লব ও লেনিনের রচনা-সংগ্রহও এনেছি। আমার ডেস্কের ওপর পড়ে আছে। একদিন সকালে এই ডেস্কের পাশ দিয়ে কলঘরে যাবার সময়ে এই তিনখানা বই মায়ের চোখে পড়ে। একটার পর একটা বই হাতে তুলে—চোখ বুলিয়ে বিষয়বস্তু দেখে নিলেন। তারপর করুণ চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বিষাদ মাখানো, কিন্তু তাতে নিষেধ বা বিতৃষ্ণা নেই। সে সময় আমার দিকে একবার করুণ চোখে তাকালেন। মা ভালোবাসতেন হুগো, ডুমার "পিতা-পুত্র," মুসেৎ এবং দোদের রচনাবলী; কিন্তু আমি জানি এই সব প্রণয়মধুর উপন্যাসগুলোও বিদ্রোহের সুরে ভরা।

মায়ের মতো যাঁরা দৈব শিক্ষা নিয়ে জন্মেছেন—জানি কথাগুলো অদ্ভুত শোনাচ্ছে—তাঁরাই বিপ্লবকে অত্যন্ত সহজ মনে, স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এমন কি রোজা লুক্সেমবার্গের এ বইতেও আমি আপত্তিকর উক্তি পেয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতো লোকের মনেও বইটি যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেক করে। তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু অর্থনীতি এবং সেভাবে পড়তে গেলে বইখানি বাস্তবিক নীরস। এর ভেতর লেখিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মামুলি বিষয় আলোচনা করেছেন। হ'তে পারে আমি অর্থনীতি বুঝি না। যে কারণেই হোক না কেন এর বিষয়বস্তুতে আমার আদৌ আগ্রহ নেই। মানবমাত্রেই লোভী এবং কোনোদিনই লোভমুক্ত হ'তে পারে না এই অনুমান-নির্ভর যে-বিজ্ঞান, নির্লোভ মানুষের কাছে তা অর্থহীন। কিন্তু তবু এ বই পড়তে-পড়তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আমার উত্তেজনার সীমা থাকে না। কারণটা হলো চিরাচরিত

বিশ্বাসের মূলে বিনা দ্বিধায় কুঠারাঘাত করার মতো সৎসাহস লেখিকার আছে। নীতির বিরুদ্ধে মন যতো বিদ্রোহই করুক না কেন, আমার প্রেমাস্পদের স্ত্রী নিশ্চিন্ত দ্রুত পায়ে তাঁরই বাড়ি ফিরে আসছেন—এ দৃশ্য তো চোখের ওপর থেকে মুছে ফেলতে পারি না। তখনই আমার মনে ধ্বংসের নেশা লাগে। বিনাশ যেমন করুণ বিষাদময়, তেমনি সুন্দর। ধ্বংস, তারপর নতুন ক'রে গড়া, পরিপূর্ণতার স্বপ্ন! হয়তো বিনাশের পর নতুন ক'রে সৃষ্টি করার দিন ফিরে নাও আসতে পারে, তবু প্রেমের উন্মাদনায় ধ্বংস আমায় করতেই হবে। বিপ্লবের সূত্রপাত আমায় করতেই হবে। রোজা তার অভিন্ন হৃদয়ের প্রেম মার্কসবাদে সমর্পণ ক'রে বসে আছে।

বারো বছর আগের এক শীতকাল।

"সারাশিনা ডায়েরির সেই মেরুদণ্ডহীন মেয়েটির মতো তুমিও কখখনো মুখ খোলো না। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভার।"

এই ব'লে আমার বন্ধু চলে গেলো। এইমাত্র আমি তাকে লেনিনের একখানা বই না পড়েই ফেরত দিলাম।

"বইটা পড়লে?"

"অত্যন্ত দুঃখিত, পড়া হয়নি।"

কথা হচ্ছিলো একটা পুলের কাছে দাঁড়িয়ে। এখান থেকে টোকিওর রুশ রক্ষণশীল গীর্জা দেখা যায়।

"কেন, কি হলো?"

বন্ধুটি আমার চেয়ে এক ইঞ্চি লম্বা, আর অনেক ভাষা জানতো। লাল টুপিটা তাকে চমৎকার মানিয়েছিলো। মেয়েটি ছিলো অপূর্ব সুন্দরী। মোনালিসার মতো চেহারা ব'লে নাম-ডাক ছিলো তার।

"মলাটের রঙটা বিচ্ছিরি লাগলো।"

"তুমি অদ্ভুত। আমি ঠিক জানি আসল কারণ ওটা নয়। তুমি আমায় ভয় করতে শুরু করেছো। তাই না?"

"না, তোমায় ভয় করতে যাবো কেন? মলাটের রঙটা সহ্য হলো না।"

সখেদে মেয়েটি বলে উঠলো, "ও।" তারপরেই আমায় সে "সারাশিনা ডায়েরির" মেয়ের সঙ্গে তুলনা করলো। আমার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে শীতের নদীর দিকে চেয়ে রইলাম।

"যাই, যদি এই আমাদের শেষ দেখা হয়, তাহলে বিদায় বন্ধু, চির বিদায়। বায়রন;" নিজের মনে গুনগুনিয়ে মূল বায়রন ইংরেজিতে আবৃত্তি ক'রে গেলো। তারপর আমায় আলগোছে একবার আলিঙ্গন করলো।

নিজের প্রতি ধিক্কারে মন ভ'রে গেলো। ফিস্‌ফিস্ ক'রে মাপ চেয়ে নিলাম। তারপরেই স্টেশনের দিকে পা চালালাম। একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বান্ধবী তখনও সেখানে সেইভাবেই আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আমরা দুজনে এক স্কুলে না পড়লেও একই বিদেশী শিক্ষকের কাছে ভাষা শিখতে যেতাম।

তারপর বারো বছর কেটে গেছে। "সারাশিনা ডায়েরি"-র অবস্থা পেরিয়ে আমি আর এক পা-ও এগোইনি। এতোকাল ধ'রে আমি তবে কী করলাম! বিপ্লবের প্রতি আমার আকর্ষণ কম, আর প্রেম কাকে বলে তাও জানি না। দুনিয়ার যতো বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ চিরকালই বিদ্রোহ এবং প্রেম এই দুটি অনুভূতিকে চরম নির্বুদ্ধিতা এবং ঘৃণ্য ব'লে গেছেন। যুদ্ধের আগে এমন কি যুদ্ধের সময়েও আমরা সেকথা মেনেছি। কিন্তু পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের প্রতি

আস্থা হারিয়েছি এবং বুঝেছি প্রবীণ বিজ্ঞেরা যা বলেন তার উলটোটাই হলো জীবনের খাঁটি সত্য। বস্তুত বিদ্রোহ আর প্রেম হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে উপভোগ্য এবং ঠিক এই কারণেই জ্ঞানী-বৃদ্ধেরা নাগালের বাইরে বলে 'আঙুর-টক' জাতীয় ছলনায় আমাদের প্রতারণা করতে চেয়েছেন। আমি সাধারণ সত্য হিসেবে এই কথাই বিশ্বাস করতে চাই যে, প্রেম আর বিদ্রোহের জন্যই মানুষের জন্ম।

হঠাৎ দরজার ফাঁকে মায়ের হাসিমুখ দেখা গেলো, "ঘুমোওনি এখনো? ঘুম আসছে না?"

ডেস্কের ওপর ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত দুপুর হয়ে গেছে। "না, আমার একটুও ঘুম আসছে না, সমাজতন্ত্রের ওপর একখানা বই পড়ে মাথা গরম হয়ে গেছে।"

"ও! আচ্ছা, বাড়িতে কোনোরকম পানীয় নেই, না? এরকম অবস্থায় শোবার আগে এক গেলাস কিছু খেয়ে নিলে, গভীর ঘুম আসে।" মায়ের গলার স্বরে, কথার ঢঙে কেমন যেন কৌতুকের আভাস, কিন্তু ঠিক বোঝাতে পারছি না তাঁর সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে কেমন যেন আব্দার আর ভান মেশানো।

শেষ পর্যন্ত অক্টোবর মাস এলো, কিন্তু আকাশে-বাতাসে তেমন ক'রে শরতের রং লাগলো না। বরং বর্ষাকালের মতো একটার পর একটা গরম স্যাঁৎস্যাঁতে দিন পার হয়ে গেলো। প্রতি সন্ধ্যায় মায়ের জ্বর একশোর কিছু ওপরে লেগে রইলো।

একদিন সকালে হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে ঘাবড়ে গেলাম মায়ের হাতটা ফুলে উঠেছে। সকালের খাবারটা মা বরাবরই যত্ন ক'রে খান, কিন্তু ইদানীং সকালের দিকে নামে মাত্র ভাতের ক্বাথ মুখে দেন। কড়া গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেতে পারেন না। সেদিন

সুপের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার গন্ধটুকু পর্যন্ত সইতে পারলেন না। সুপটা মুখের কাছে তুলে, না চেখেই ট্রের ওপর নাবিয়ে রাখলেন। সেই সময়ে আমার নজর পড়লো মায়ের ডান হাতখানা ফোলা।

"মা তোমার হাতে কি হলো ?"

মুখখানাও কেমন যেন ফোলা-ফোলা ফ্যাকাশে লাগলো।

"ও কিছু নয়। অতোটুকু ফোলায় কিছু এসে যায় না।"

"কদিন হলো এমন হয়েছে ?"

মা কোনো উত্তর দিলেন না। চোখে-মুখে কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব। আমার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইলো, ঐ বিকৃত হাতখানা কিছুতেই আমার মায়ের নয়। ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো মেয়ের হাত। আমার মায়ের হাত কত সুন্দর, ছোট্টো। আমার পরিচিত হাত; যে হাত ভালোবাসার মতো। সেই হাত কি তবে চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হলো ? বাঁ হাতখানা এখনও অতোটা ফোলে নি। কিন্তু আর যে আমি মায়ের দিকে চেয়ে থাকতে পারছি না। ঘরের কোণে রাখা ফুলের ঝুড়িটার দিকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

টের পাচ্ছি চোখের জল রুখতে পারবো না। অসহ্য বোধ হওয়ায় হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, নাওজি একটা নরম সেদ্ধ ডিম খাচ্ছে। ক্বচিৎ কখনও বাড়ি এলে রাতটা ওসাকির ওখানে মদ খেয়ে কাটায়। সকালে রান্নাঘরে গিয়ে দেখা যায় যে, একা ব'সে গোমড়া মুখে নরম সেদ্ধ ডিম খাচ্ছে। এই একমাত্র খাবার যা ও খুশিমনে খায়। তারপর তেতলায় নিজের ঘরে গিয়ে সারাটা দিন বিছানায় শুয়ে-বসে কাটায়।

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বললাম, "মায়ের হাতখানা ফুলে উঠেছে।" আর বলতে পারলাম না, কান্নায় সারাদেহ কেঁপে উঠছে।

নাওজি কোনো উত্তর দিলো না।

এবার আমি মুখ তুলে চাইলাম, "আর কোনো আশা নেই। তুমি লক্ষ্য করোনি? ওরকম ফুলতে শুরু হলে আর আশা থাকে না।" টেবিলের প্রান্ত শক্ত মুঠোয় ধ'রে কোনোমতে দাঁড়িয়েছিলাম।

নাওজির মুখখানাও মেঘে ঢেকে এলো। "আর দেরি নেই। ধুত্তোর! কী ঝামেলায় পড়া গেলো!"

"মাকে আমি বাঁচাতে চাই, যেমন ক'রেই হোক, মাকে ফিরে পেতেই হবে।" নিজের হাত দুটো মোচড়াতে-মোচড়াতে বললাম। হঠাৎ নাওজি কান্নায় ভেঙে পড়লো, "দেখছো না, মা এখন আমাদের হাতের বাইরে! কিছু করবার সাধ্য কি?" হাতের পিঠ দিয়ে জোরে-জোরে চোখ কচলাতে লাগলো সে।

সেদিন নাওজি টোকিওতে ওয়াদামামাকে খবর দিলো কি করা যায়, তার নির্দেশ নিতে চলে গেলো। মায়ের পাশ থেকে যেটুকু সময় উঠে আসতে হচ্ছিলো, তার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কেঁদে-কেঁদে কেটেছে। সকালে কুয়াশা ভেদ ক'রে, দুধ আনতে যাবার সময়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চুল বাঁধার সময়ে, ঠোঁটে লিপস্টিক দেবার সময়ে সারাক্ষণ শুধু কেঁদেছি। মায়ের সঙ্গে আমার আনন্দের দিনগুলো, নানা ছোটোখাটো ঘটনা চোখের সামনে ছবির মতো ভাসছিলো। কান্নার কোনো সীমা, সার্থকতা ছিলো না তখন। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে চীনাঘরের সামনের বারান্দায় বসে-বসে সমানে কেঁদেছি। হেমন্তের আকাশভরা তারার শোভা, পায়ের কাছে না জানি কার একটা বিড়াল চুপ ক'রে গুটিয়ে বসে আছে।

পরদিন মায়ের হাতের ফোলা আরও বেড়ে গেলো। খাবার সময়ে মোটে কিছুই খেলেন না। কমলার রস পর্যন্ত গলার ব্যথায় গিলতে পারলেন না।

"মা, নাওজির ব্যবস্থামতো সেই মুখ-ঢাকা আবার কিছুদিন

প'রে দেখবে ?" হাসি দিয়ে কথাগুলো ভোলাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনের উদ্বেগ চাপা রইলো না।

মৃদুস্বরে মা বললেন, "রোজ রোজ এতো খাটুনি সইছে না নিশ্চয়ই। শরীরপাত হচ্ছে। আমার জন্য একটা নার্সের ব্যবস্থা করো।"

বুঝলাম তাঁর নিজের চেয়েও আমায় নিয়ে চিন্তা বেশি এবং এতে আরও বেশি মন খারাপ হয়ে গেলো।

দুপুরের খানিক পরে নাওজি ডাক্তার মিয়াকি এবং একজন নার্স সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। বুড়ো ডাক্তার সাধারণত হাসি-ঠাট্টা করতে ভালোবাসেন, কিন্তু আজ কোনো কথা না ব'লে সোজা রোগীর ঘরে ঢুকে পরীক্ষা শুরু করলেন। কাজ শেষ ক'রে নিজের মনেই বললেন, "বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন।" একটা ক্যামফর ইনজেক্‌শন দিলেন।

প্রলাপের মধ্যেই মা প্রশ্ন করলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার থাকবার জায়গা আছে তো ?"

"নাগাওকাতে আগে থেকেই জায়গা ঠিক করা আছে। আপাতত পরের কথা ছেড়ে নিজের বিষয় একটু ভাবুন তো। যা ভালো লাগে তাই বেশি বেশি ক'রে খান। পুষ্টিকর খাবার খেলে ভালো বোধ করবেন। আমি কাল আবার আসবো। নার্স রেখে গেলাম, প্রয়োজন মতো এর সেবা নিতে দ্বিধা করবেন না।" মায়ের বিছানার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে কথা ব'লে ইশারায় নাওজিকে কাছে ডাকলেন। যখন সে ফিরে এলো, তার মুখ দেখেই বুঝলাম সে প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। আমরা নিঃশব্দে রোগীর ঘর থেকে খাবার ঘরে এলাম।

"আর কি কোনো আশা নেই? উনি কি বললেন ?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে বিকৃত হাসিতে নাওজির ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। "যতো ঝামেলা! মা আগের তুলনায় অনেক বেশি কাহিল

হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবুর মতে আর দু-একদিনের বেশি নয়।” বলতে-বলতে ওর চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

আমি বললাম, “সবাইকে বোধহয় টেলিগ্রাম করা দরকার।” আশ্চর্য! কেমন ক’রে যেন নিজের ওপর জোর ফিরে এসেছে।

“ওয়াদামামার সঙ্গে কথা হলো। উনি বললেন, আমাদের বর্তমান অবস্থায় এতো বড়ো আয়োজন করা সম্ভব নয়। ধরো যদি আত্মীয়-স্বজন সব এসে উপস্থিত হয়। তাহলে আমাদের এতো-টুকু বাড়িতে তাদের ঠাঁই দেবে কোথায়? তাছাড়া কাছাকাছি কোনো ভালো হোটেল-পত্তর কিছু নেই। তাঁর কথার ভাবে বুঝলাম আমাদের পরিবারের মহা-মহারথীদের নিমন্ত্রণ করার কথা আমাদের আর ভাবা উচিত নয়। ওয়াদামামা নিজেই আসছেন, কিন্তু চিরকালই উনি এতো কৃপণ যে ওঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করি না। গতরাত্রের মতো এমন দুঃসময়েও উনি মায়ের অসুখের কথা ভুলে গিয়ে আমায় হিতোপদেশ দেওয়া শুরু করলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন নজির কোথাও নেই যেখানে কৃপণের বক্তৃতায় অজ্ঞান আলোর সন্ধান পেয়েছে। এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ, মার কথা তো ছেড়েই দিলাম। ওঁকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।”

“কিন্তু হাজার হোক, এখন থেকে আমাকে যদি বা না-ও হয়, তোমায় তো ওঁর ওপরেই ভরসা করতে হবে।”

“কখখনো না। বরং ভিক্ষে ক’রে খাবো। বোনটি আমার, তোমাকেই বরং ওঁর মুখ চেয়ে থাকতে হবে।”

“আমি—?” চোখে জল এলো, “আমার যাবার জায়গা আছে।”

“বিয়ে করবে? ঠিক হয়ে গেছে?”

“না।”

“স্বাধীন জেনানা? চাকরি করবে? হাসিও না বাপু।”

"না চাকরি নয়, বিদ্রোহী দলে যাবো।'

"কী ?" অদ্ভুত চোখে নাওজি আমার দিকে তাকালো।

ঠিক সেই সময়ে নার্সের গলা পেলাম,—"মা আপনাকে বোধহয় কোনো কাজে ডাকছেন।"

ছুটে গিয়ে মায়ের পাশে বসলাম। মাথাটা তাঁর মুখের কাছে নামিয়ে জিগগেস করলাম—"কি মা ?"

মা চুপ ক'রে রইলেন, কিন্তু আমি বুঝলাম, কি যেন বলার চেষ্টা করছেন।

"জল ?"

আস্তে মাথা নেড়ে না বললেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেই খুব মৃদু স্বরে জানালেন, "স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"কী স্বপ্ন ?"

"সাপের বিষয়।"

আমি শিউরে উঠলাম।

"আমার বিশ্বাস গাড়ি-বারান্দার সামনে সিঁড়িতে লাল ডোরাকাটা সাপিনী এসেছে। দেখো তো গিয়ে।"

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম আমার সারা দেহ হিম হয়ে গেছে। বারান্দা অবধি গিয়ে কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকালাম। সিঁড়ির ওপর নিশ্চিন্তে দেহ এলিয়ে শরতের সূর্যকে উপভোগ করছে একটা সাপিনী। আমার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো।

তোমায় আমি চিনি। শেষ তোমায় যা দেখেছি তার চেয়ে তুমি বড়ো হয়েছো, বুড়ো হয়েছো কিন্তু তুমি সেই ডিমেদের মা, যাদের আমি পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিলাম। তোমার প্রতিশোধ তো আমার ওপর দিয়ে নিলে, এবার তুমি দূর হও।

সাপিনীর ওপর দৃষ্টিবদ্ধ রেখেই আমি মনে মনে এই প্রার্থনা

করলাম, কিন্তু তার এতোটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। কেন জানি না সাপিনীটা নার্সের চোখে পড়ে, এটা আমার ইচ্ছে ছিলো না। সেইজন্য অনাবশ্যক জোরে মাটিতে পা ঠুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গলায় চেঁচিয়ে বললাম,—"না মা এখানে তো কোনো সাপ দেখছি না। ও তোমার মিথ্যে স্বপ্ন।" আবার সিঁড়ির দিকে দেখি এতক্ষণে নড়েচড়ে সাপটা চলে যাচ্ছে।

আর কোনো আশা নেই, কোনো আশাই নেই। সাপটা নজরে পড়ার পর থেকে একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। আমি জানতাম বাবার মৃত্যু সময়ে একটা কালো সাপ বিছানার পাশে দেখা গিয়েছিলো, আমি নিজেই বাগানের সমস্ত গাছে সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

মনে হলো মা বিছানায় উঠে বসার শক্তিটুকুও হারিয়েছেন এবং সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। আমি নার্সকে মায়ের সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। খাবার তাঁর গলা দিয়ে প্রায় নামে না। সাপটা চোখে দেখার পর সমস্ত উদ্বেগ কেমন যেন গলে গিয়ে স্বস্তি বোধ হলো। দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে শান্তি পেলাম। আমার একমাত্র কাজ দাঁড়ালো মায়ের পাশে যতোটা সম্ভব সময় কাটানো।

পরদিন সারাক্ষণ মায়ের পাশে বোনা নিয়ে বসে রইলাম। সেলাই বা বোনায় আমার বেশির ভাগ লোকের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত চলে, কিন্তু কাজ নিপুণ নয়। মা আমার বোনায় প্রায়ই খুঁত বার ক'রে দিতেন। সেদিন বোনাটা আমার আসল উদ্দেশ্য ছিলো না, কিন্তু সারাদিন ঐ ভাবে মায়ের পাশে বসে কাটানোয় তাঁর মনে যাতে কোনো সন্দেহ না হয়, সেইজন্য উলের বাক্স নিয়ে আড় হয়ে বসে বুনতে লাগলাম, যেন দুনিয়ায় এ ছাড়া আমার কোনো চিন্তাই নেই।

মা আমার হাতের দিকে চেয়ে রইলেন, "তোমার নিজের মোজা বুনছো, না? মনে রেখো লম্বার দিকে আট ঘর না বাড়ালে পরার সময় আঁট হবে।"

ছেলেবেলায় মা হাজার সাহায্য করলেও কিছুতেই আমি ঠিক বুনতে পারতাম না, আজও সেইরকম বোনা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি এই শেষবার মা দেখিয়ে দিচ্ছেন আর কোনো দিনও মা আমার ভুল ধরিয়ে দেবেন না—একথা মনে হতেই বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। চোখের জলে বোনা দায় হলো।

মাকে ঐ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে মনে হচ্ছিলো না যে তাঁর শরীরে কোনো কষ্ট আছে। সকাল থেকে আজ আর কিছুই খাননি। সারাদিন থেকে থেকে শুধু গজ-কাপড় চায়ে ডুবিয়ে তাঁর ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিচ্ছিলাম। যাই হোক তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিলো এবং মাঝে মাঝে শান্ত গলায় কথা বলছিলেন, "খবরের কাগজে একবার সম্রাটের ছবি দেখেছিলাম আর একবার ছবিখানা দেখতে ইচ্ছে করছে।"

কাগজের ঐ অংশটা মায়ের মুখের ওপর তুলে ধরলাম।

"বুড়ো হয়ে গেছেন।"

"না, ছবিটা তেমন ভালো ওঠেনি। সেদিন আরেকটা ছবিতে দেখলাম দিব্যি হাসি-খুশি অল্পবয়েস দেখাচ্ছিলো। বোধহয় আজকাল আগের তুলনায় ভালোই আছেন।"

"কেন?"

"সম্রাট এখন মুক্তি পেয়েছেন।"

ম্লান হেসে মা বললেন, "আজকাল কাঁদতে চাইলেও আমার কান্না আসে না।"

হঠাৎ মনে হলো মায়ের কি এখন খুশি হবার পালা এসেছে? শোকের প্রবাহে নিমজ্জিত সুখের অস্পষ্ট অনুভূতি নদীর নীচে

সোনার ঝলকানির মতো মনে হচ্ছে বোধহয়। সব দুঃখের সীমা অতিক্রম ক'রে এই যে ক্ষীণ আলোর আভাস একে যদি সুখানুভূতি বলা যায়, তবে আমাদের সম্রাট, আমার মা-মণি, স্বয়ং আমি পর্যন্ত সুখী বলা যেতে পারে।

শরতের শান্ত সকাল। সূর্যালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে মনোরম উদ্যান শোভা। হাতের বোনা নামিয়ে দূরে উজ্জ্বল সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে বললাম, "মা এতোদিন আমি সংসারের বিষয় কিছুই জানতাম না।" আরও অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঘরের কোণে নার্স শিরার মধ্যে ইনজেকসন দেবার ব্যবস্থা করছিলো, পাছে তার কানে যায় এই ভেবে লজ্জায় কথার মাঝে চুপ করে গেলাম। আমার কথার খেই ধরে মৃদু হেসে মা বললেন, "তুমি যে বললে এতোদিনে —তার মানে এখন তুমি সংসারকে চিনছো?"

আমার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

"আমি কিন্তু আজও চিনি না।" ব'লে মা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। নিচু গলায় যেন নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন কথাটা। "আমিও বুঝি না, কেউ বোঝে কিনা তাও জানি না। সময় তার নিজের মতো বয়ে চলে যায়, আমরা সবাই ছেলেমানুষই থেকে যাই। কিছুই বুঝি না আমরা।"

বাঁচতে আমাকে হবেই। হয়তো আমার ছেলেমানুষী হতে পারে, তবু শুধু দুনিয়ার দাবি মেনে চলা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন থেকে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। মনে হলো মা তাঁদের শেষ প্রতিনিধি যাঁরা অতি সুন্দর এবং বিষণ্ণভাবে জীবনের অবসান ঘটাতে পারেন—কারো সঙ্গে বিবাদ নেই, কারো প্রতি ঘৃণা নেই, কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এমন লোকের ঠাঁই হবে না। মৃত্যু সুন্দর, কিন্তু বেঁচে থাকা, প্রাণধারণের গ্লানিতে ক্রমশই যেন রক্তে কলুষিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গর্ভবতী সাপিনীকে

একদিন যে-ভাবে মাটিতে গর্ত খুঁড়তে দেখেছিলাম, আমিও মাটিতে শুয়ে শরীরটাকে সেই ভঙ্গিতে গুটিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু পারিনি এমন একটা কিছু আছে আমার আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে, যার কাছে আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব। বলতে পারো সেটা আমার নীচতা, কিন্তু আমাকে বাঁচতেই হবে, আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য দুনিয়ার সঙ্গে আমায় লড়তে হবে। এখন যখন স্পষ্ট বুঝলাম মায়ের আয়ু ফুরিয়েছে তখন আমার মন থেকে কল্পনাবিলাস ভাবালুতা সব উবে যাচ্ছে। এখন আমি দিনদিন হিসেবি—আদর্শহীন হয়ে উঠছি।

দুপুরে আমি মায়ের ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছি, এমন সময়ে ফটকের কাছে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম। ওয়াদামামা ও মামীমা টোকিও থেকে এলেন। মামা সোজা রোগীর ঘরে ঢুকে মার পাশে বসলেন। মা রুমাল দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে মামার দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন, কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল এলো না। মাকে আমার একটা পুতুলের মতো মনে হলো।

"নাওজি কোথায়?" কিছুক্ষণ পরে মা আমায় জিগগেস করলেন।

আমি তেতলায় গিয়ে দেখি নাওজি সোফায় শুয়ে একটা পত্রিকা পড়ছে। আমি বললাম, "মা তোমায় ডাকছেন।"

"কী—আবার সেই করুণ দৃশ্য? অয়ি বীরাঙ্গনা ক্ষীণ অনুভূতি সম্পন্না নারী, ধৈর্য ধ'রে তোমার কর্তব্য সাধন করো! আমরা যারা প্রকৃতই শোকার্ত—যাদের প্রাণ চায় কিন্তু শরীরে কুলোয় না তাদের পক্ষে মায়ের পাশে বসে থাকা অসম্ভব।" জামা গায়ে দিয়ে সে আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলো।

আমরা ভাইবোনে যখন মায়ের বিছানার কাছে গিয়ে পাশাপাশি বসলাম, তখন হঠাৎ চাদরের নীচ থেকে হাত বের ক'রে মা নিঃশব্দে প্রথমে নাওজি, পরে আমার দিকে নির্দেশ ক'রে অনুরোধের ভঙ্গিতে জোড় হাতে মামার দিকে তাকালেন।

উদারভাবে ঘাড় নেড়ে মামা বললেন, "হ্যাঁ বুঝেছি, আমি বুঝেছি।"

মা আলতোভাবে চোখ বুজলেন। মনে হলো মামার কথায় যেন নিশ্চিন্ত হলেন। আবার হাত ছুটি চাদরের ভেতর টেনে নিলেন।

আমি কাঁদছিলাম, নাওজি চোখ নিচু করে ফোঁপাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে ডাক্তার মিয়াকি এসে পৌঁছলেন। তিনি এসেই একটা ইনজেকসন দিলেন। মামাকে দেখে মা বোধহয় মনে করলেন যে তাঁর আর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বললেন, "ডাক্তারবাবু দয়া ক'রে আমার যন্ত্রণার শেষ করে দিন।"

ডাক্তারের সঙ্গে মামার একবার চোখাচোখি হলো। ছুজনের মধ্যে কারুর চোখই শুকনো ছিলো না।

খাবার ঘরে গিয়ে যা হোক একটু খাবার ব্যবস্থা করলাম। ডাক্তারবাবু, নাওজি, মামা-মামীমার জন্য চার প্লেট খাবার চীনা-ঘরে নিয়ে গেলাম। টোকিও থেকে মামা স্যাণ্ডউইচ এনেছিলেন, মাকে দেখিয়ে তাঁর পাশে রেখে দিলাম।

মা বিড়বিড় করে বললেন, "তোমার উপর খুব ঝক্কি চলেছে।"

চীনাঘরে বসে আমাদের কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। মামা-মামীমার সে-রাতে টোকিওতে কি যেন দরকার ছিলো, তাঁদের তাই ফিরে যেতে হলো। মামা আমার হাতে খামে ক'রে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। স্থির হলো তাঁরা ডাক্তারের সঙ্গেই ফিরবেন। ডাক্তার মিয়াকি ইতিমধ্যে নার্সকে পরবর্তী চিকিৎসার কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ধরে নেওয়া গেল ইনজেকসনের গুণে মা আরও দিন চার-পাঁচ বাঁচবেন। তখন অবধি তাঁর পুরো জ্ঞান ছিলো, হার্টও বিশেষ জখম হয়নি।

সবাইকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মায়ের পাশে ফিরে এলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে সব সময়েই তাঁর মুখে কেমন যেন

দরদ ফুটে উঠতো। ফিসফিস ক'রে আমায় বললেন, "তোমার ওপর দিয়ে খুব ঝড়-ঝাপটা চলেছে।" মুখখানা যেন উত্তেজনায় ঝলমল করছে। মনে হলো মামাকে দেখে বোধহয় খুশি হয়েছেন।

এরপর মা আর কথা বলেন নি।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শান্ত শরতের গোধূলি লগ্নে নার্স তাঁর নাড়ি দেখছিলো। নাওজি ও আমি, তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে তাঁকে দেখছিলাম। তারই মাঝে আমাদের সুন্দরী মা—জাপানের শেষ সম্ভ্রান্ত মহিলা চ'লে গেলেন।

মৃত্যুতেও তাঁর মুখ প্রায় অবিকৃত। বাবার মৃত্যুর পর দেখেছিলাম হঠাৎই তাঁর মুখখানা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মায়ের মুখখানা জীবিতকালের মতোই সুন্দর রয়ে গেলো। শুধু শ্বাসপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে, তাও এতো শান্তভাবে গেলো যে আমরা টেরই পেলাম না কখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আগের দিনই মুখের ফোলাটা কমে গিয়েছিলো, এখন তাঁর গাল দুটি মোমের মতো মসৃণ দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাসিতে স্ফুরিত হয়ে আছে। জীবিতকালের চেয়েও যেন অনেক বেশি লাবণ্যে ভরা। হঠাৎ মনে হলো মৃত যীশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকা মেরীর সঙ্গে এই চেহারার কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় | বিদ্রোহের সূচনা

বিদ্রোহের সূচনা।

চিরদিন শোকসাগরে ডুবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। অন্য কিছু আছে যার জন্য আমায় প্রাণপণে যুদ্ধ করতেই হবে। নতুন নীতিশাস্ত্র। না—সে কথাটা ব্যবহার করাও ভণ্ডামি। প্রেম। শুধু তাই, আর কিছু নয়। অর্থনীতির নতুন তত্ত্ব যেমন রোজা লুক্সেমবুর্গের বেঁচে থাকার প্রেরণা ছিলো, তেমনি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রেমকে আঁকড়ে থাকতে হবে। ইহুদী আইন বিশারদ, আচারনিষ্ঠ ভণ্ড ও প্রতাপশালী ব্যক্তিদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে নির্ভয়ে ঈশ্বরের পায়ে আত্মবিসর্জন দেওয়ার যে বাণী যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যের মুখে দিয়েছিলেন, আমার বর্তমান অবস্থায় তা বিশেষ অপ্রযোজ্য হবে না।

"তোমাদের গেঁজিয়ায় স্বর্ণ কি রৌপ্য কি পিতল, এবং যাত্রার জন্য থলি দুইটি আঙরাখা কি পাদুকা কি যষ্টি, এ সকলের আয়োজন করিও না;

"দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি; অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় নিরীহ হও।

"আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় করো।

"মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।

"কেননা আমি পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার এবং শাশুড়ির সহিত বধূর বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি;

"আর আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হইবে।

"যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক ভালোবাসে, সে আমার

যোগ্য নয়, এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভালোবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।

"আর যে কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাতে না আইসে, সে আমার যোগ্য নয়।

"যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে, এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।"*

বিদ্রোহের সূচনা।

যদি প্রেমের কারণে আমি যীশুর এই বাণী পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করবার শপথ নিই, তবে কি তিনি আমায় অপরাধী করবেন? কেন দেহজ প্রেম নিন্দনীয়, আর আত্মিক প্রেম মহান আমি বুঝি না। আমার ধারণা দুই-ই এক। যে নারী প্রেমের জন্য, অবোধ্য এক প্রবৃত্তির জন্য, কিংবা আনুষঙ্গিক দুঃখের কারণে দেহ মনকে নরকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আমি সেই নারী। এই আমার গর্ব।

ইজুতে সমাধি এবং টোকিওতে অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা মামাই করলেন। তারপর নাওজি ও আমি দুজনে একসঙ্গে সংসার চালাতে গিয়ে এমন বিশ্রী মোড় নিলো যে, মুখোমুখি হলেও পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয় না। মায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি ক'রে নাওজি তার পুস্তক প্রকাশনীর মূলধন সংগ্রহ করলো। টোকিওতে নেশার চূড়ান্ত ক'রে ও যখন টলতে-টলতে বাড়ি ফিরতো, তখন তার মড়ার মতো শাদা মুখখানা দেখে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত রোগার শেষ অবস্থা ব'লে মনে হতো।

একদিন বিকেলে একটি বাঈজী মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরলো। এরপর এক দণ্ডও আর তিষ্ঠনো যায় না। দেখে আমি বললাম,

* বাইবেলের এই অংশের অনুবাদ ব্রিটিশ ও ফরেন বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত "ধর্মপুস্তক" থেকে গৃহীত।

"আজ আমি টোকিও গেলে ভালো হয় না কি? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল দেখা হয়নি, তার ওখানেই দুটো-তিনটে দিন কাটিয়ে আসবো। তুমি এই কটা দিন সংসার দেখো কেমন? তোমার বান্ধবী রান্না ক'রে দেবে'খন।"

নাওজির দুর্বলতার সুযোগ নিতে এক দণ্ডও দেরি করলাম না। সুতরাং সহজেই সর্পের মতো বিচক্ষণতার প্রয়োগ ক'রে ব্যাগের ভেতর প্রসাধনের টুকিটাকি, আর কিছু খাবার নিয়ে টোকিওতে অভিসারে বেরুলাম।

একসময়ে কথাচ্ছলে নাওজির কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে টোকিওর শহরতলির লাইনে ওগিকাবু স্টেশনের উত্তর ফটক থেকে মিস্টার উয়েহারার বাড়ি মাত্র কুড়ি মিনিটের রাস্তা। সেদিন এলোমেলো বেগে শরতের হাওয়া উঠেছিলো। ওগিকাবু স্টেশনে নামতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। পথে একজনকে উয়েহারার বাড়ির ঠিকানা জিগগেস করলাম। সঠিক নির্দেশ পাবার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেক অন্ধকার অলি-গলিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম। নিজেকে এতো নিঃসঙ্গ মনে হলো যে চোখে জল এলো। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলো। অসহায় হয়ে ভাবছি কি করা যায় এমন সময় ডানহাতি বাড়ির সারির মধ্যে একটার গায়ে গৃহকর্তার নাম-লেখা ফলক চোখে পড়লো। অন্ধকারে শাদা অংশ বোঝা যাচ্ছিলো। কেমন যেন মনে হলো এ নিশ্চয় উয়েহারার নাম। এক পায়ে চটি প'রে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগোলাম। নামের ওপর হুমড়ি খেয়ে দেখলাম বাস্তবিক তাই, "উয়েহারা জিরো," কিন্তু বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার।

মিনিট খানেক চুপ ক'রে ভাবলাম, কি করা যায়। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে দরজায় গা এলিয়ে দিলাম, যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো।

জানলার শার্সিতে দু-হাতের আঙুল দিয়ে টোকা মেরে ফিস ফিস ক'রে ডাকলাম, "উয়েহারা।"

সাড়া মিললো বটে, কিন্তু মেয়েলি গলার!

ভেতর থেকে দরজা খুলে যেতে আমার চেয়ে বছর তিন-চারেকের বড়ো সেকেলে ক্ষীণাঙ্গী এক মহিলাকে ঘরের মধ্যে দেখা গেলো। মৃদু হেসে জিগগেস করলেন, "কে গো?" গলার স্বরে না আছে হিংসে, না আছে ভয় দেখানো রাগ।

"মাপ করবেন। আমি···" নাম বলার অবকাশ হলো না, আমার প্রেম ওঁর চোখে ঘৃণ্য রূপ নিতে পারে এই আশঙ্কায় সবিনয় প্রশ্ন করলাম, "মিস্টার উয়েহারা বাড়ি আছেন কি?"

"না।" আমার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাকালেন। "কিন্তু তিনি সাধারণত যেখানে যান···"

"এখান থেকে অনেক দূর কি?"

"না।" আমার কথায় কৌতুক বোধ করছেন যেন, এইভাবে মুখের ওপর হাত রাখলেন। "ওগিকাবুতে। স্টেশনের সামনে শিরাইশি খাবারের দোকানে খোঁজ নিলে, তারা বলতে পারবে।"

উত্তেজনায় লাফাতে ইচ্ছে হলো।

"ওকি আপনার চটির এ অবস্থা কি ক'রে হলো?" আমায় ভেতরে ডেকে আনলেন। ঘরের ভেতরে একটা বেঞ্চের ওপর বসলাম। উয়েহারাপত্নী আমায় একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিলেন। আমার ছেঁড়া স্ট্র্যাপটা ফেলে দিয়ে সেটা লাগালাম। আমি যখন চটি মেরামতে ব্যস্ত, তখন তিনি একটা মোমবাতি জ্বেলে আনলেন। "অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমাদের দুখানা বালবই পুড়ে গেছে। আজকাল বালবগুলোর কি ভয়ানক দাম আর কতো তাড়াতাড়ি জ্বলে যায়। আমার স্বামী বাড়ি থাকলে একখানা কিনে আনতে বলতাম, কিন্তু গত দু-রাত তিনি বাড়ি ফেরেননি,

মেয়ে নিয়ে আমি সকাল-সকাল শুয়ে পড়ি পকেটে একটা পয়সা নেই।"

অত্যন্ত সহজ-সরল হাসিমুখে তিনি কথাগুলো বললেন। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে একটি বছর বারো-তেরোর রোগা মেয়ে বড়ো-বড়ো চোখে আমায় লক্ষ্য করছিলো। মনে হলো একেবারে শিশুকে নয়। এদের আমি কিছুতেই আমায় শত্রু ব'লে মনে করতে পারলাম না, কিন্তু নিশ্চিত জানি, একদিন এই ভদ্রমহিলা আর তার মেয়ে আমায় তাদের শত্রু ব'লেই চিনবে এবং ঘৃণা করবে। এই চিন্তা মনে আসতে আমার সমস্ত প্রেম নিবে হিম হয়ে গেলো। চটি মেরামত সেরে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে তালি দিয়ে হাতের ধুলো ঝেড়ে ফেললাম। সেই মুহূর্তে অজানা দুঃখে আশঙ্কায় আমার মন ভারী হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো বৈঠকখানার ঐ অন্ধকারে দৌড়ে গিয়ে মিসেস্ উয়েহারার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে গলা জড়িয়ে কেঁদে মনটা হাল্কা করে নিই। এই চিন্তায় আমার সারা দেহ কেঁপে উঠলো, কিন্তু আমার ভবিষ্যতের আচরণের মধ্যে কী পরিমাণ ভণ্ডামি ও কদর্যতা প্রমাণিত হবে, সে কথা মনে ক'রে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।

"আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।" এই কথা ব'লে আভূমি নত হয়ে নমস্কার ক'রে ছুটে বাইরে পালিয়ে এলাম। ঝড়ে আমার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে মনে হলো। বিদ্রোহের সূত্রপাত। আমি তাঁকে ভালোবাসি, তাঁর জন্য আমার অন্তরাত্মা কেঁদে মরে। আমি বাস্তবিক তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁকে আমার চাই-ই। তাঁর প্রতি অনুরাগের বেগ রোধ করার শক্তি আমার নেই। এও জানি যে তাঁর স্ত্রীর মতো স্বভাব-মধুর মহিলা কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাঁর মেয়েটিও চমৎকার, কিন্তু আমি ভগবানের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। মনে আমার

অপরাধের গ্লানির লেশমাত্র নেই। মানুষ জন্মগ্রহণ করে প্রেম ও বিদ্রোহের জন্য। আমায় শাস্তি দেবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ভগবানের নেই। আমি খল নই। আমি তাঁকে যথার্থই ভালোবাসি এবং তাঁকে পাবার জন্য হেন কাজ নেই যা আমার অসাধ্য। প্রয়োজন হ'লে দু-তিন রাত আমি মাঠে-ঘাটে শুয়ে কাটিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমি তাই করবো।

স্টেশনের সামনে শিরাইশি খাবারের দোকান খুঁজে নিতে কষ্ট হলো না। সেখানে তাঁকে পেলাম না।

"তবে নিশ্চয় আসাগাওয়াতে আছেন। আসাগাওয়া স্টেশনের উত্তর ফটক থেকে সোজা দেড়শো গজ এগিয়ে যান। সেখানে এক লোহা-লক্কড়ের দোকান পেরিয়ে আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে উইলো নামে ছোটো একটা হোটেল দেখবেন। তারই এক পরিচারিকাকে নিয়ে বর্তমানে উয়েহারা মেতে আছেন, সেইখানেই সারাটা দিন আড্ডা দেন। আপাতত তাঁর কারবার ঐখানেই সীমাবদ্ধ।"

স্টেশনে টিকিট কেটে টোকিওর ট্রেন ধরলাম। আসাগাওয়াতে নেমে নির্দেশ মতো শেষ পর্যন্ত উইলোতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু হোটেল তখন খাঁ খাঁ করছে, কেউ নেই।

"একদল লোকের সঙ্গে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। তারা বলে গেলো, "নিশিওগির 'চিদোরি'তে রাতভোর মদ খেয়ে কাটাবো।""

এই পরিচারিকা বয়সে আমার চেয়ে ছোটোই হবে। মেয়েটিকে ধীর স্থির মার্জিত ব'লেই মনে হলো। জানি না এই মেয়েটিই তাঁর বর্তমান প্রণয়িনী কিনা!

"চিদোরি? নিশিওগির কোন জায়গায় হ'তে পারে?"

হতাশায় আমার চোখে জল আসার জোগাড়। হঠাৎ সন্দেহ হলো আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেলো না তো?

"ঠিক জানি না, তবে স্টেশনের বাঁ-দিক ঘেঁষে কাছাকাছি কোথাও হবে। যাই হোক পুলিশের কাছে বললে নিশ্চয়ই তারা ব'লে দেবে। কিন্তু ঠিক এক জায়গায় আটকে থাকার মানুষ তো উনি নন। পথের মাঝে আর কোথাও না জড়িয়ে পড়েন।"

"আমি চিদোরিতে খোঁজ নেবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ!"

আবার ট্রেনে উঠলাম, এবারে একেবারে উলটো দিকে। নিশিওগিতে নেমে ঝড় মাথায় নিয়ে পুলিস-বক্সের সন্ধানে পথে পথে ঘুরলাম। চিদোরির ঠিকানা জোগাড় ক'রে অন্ধকার রাস্তা ধ'রে প্রায় দৌড়ে চললাম। চিদোরির নীল বাতি চিনে সোজা দরজা ঠেলে ঢুকলাম। দম বন্ধ করা ধোঁয়ায় ভরা ছোট্টো ঘরে দশ-বারোজন মাতাল মস্ত এক টেবিল ঘিরে হৈ হৈ ক'রে মদ খাচ্ছে। তাদের মধ্যে তিনজন মেয়ে আমার চেয়েও কমবয়েসী—পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে সিগ্রেট টানছে আর মাতলামি করছে।

ঘরে ঢুকে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলাম। মনে হলো স্বপ্ন দেখছি বুঝি! এ যেন ভিন্ন মানুষ। মাঝের ছটা বছরে গোটা মানুষটাই পালটে গেছে।

এই কি আমার রামধনু, এম. সি—আমার বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা? ছবছর আগের মতোই চুলগুলো এলোমেলো, কিন্তু বর্তমানে বিবর্ণ ও বিরল হয়ে এসেছে। মুখখানা স্ফীত ও নিষ্প্রভ, চোখের কোণ লাল। সামনের কয়েকটা দাঁত প'ড়ে গেছে ক্রমাগত কি যেন বিড়বিড় ক'রে ব'লে চলেছেন। দেখে মনে হলো ঘরের কোণে একটা বুড়ো বাঁদর পিঠ কুঁজো ক'রে বসে আছে।

আমায় দেখে একটি মেয়ে চোখ টিপে উয়েহারাকে ইশারা করলো। ভদ্রলোক ব'সে-ব'সেই গলা বাড়িয়ে আমায় দেখলেন এবং নির্বিকার ভাবে থুতনি নেড়ে আমায় ডাকলেন। দলের আর সকলে যেন আমায় দেখতেই পায়নি এইভাবে সমানে মাতলামি করতে লাগলো,

কিন্তু ওরই মধ্যে নিজেরা একটু স'রে ব'সে উয়েহারার পাশে আমার বসবার জায়গা ক'রে দিলো।

কোনো কথা না বলে আমি চুপ ক'রে ব'সে পড়লাম।

উয়েহারা আমার গেলাস ভরে ধেনোমদ ঢেলে দিলেন। তারপর নিজের গেলাসটিও ভরে নিয়ে হেঁড়ে গলায় বললেন, "খেয়ে নাও।"

আমাদের গেলাস দুটি কোনো মতে ঠোকাঠুকি করলো এবং মৃদু করুণ টুং শব্দ হলো।

কে যেন চিৎকার ক'রে উঠলো "গিলোটিন, গিলোটিন, সু, সু, সু," সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ধুয়ো ধরলে, "গিলোটিন, গিলোটিন সু, সু, সু।" সজোরে পরস্পরের গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে মদ খেলো। দলে-দলে তারা ঐভাবে অর্থহীন কথাগুলো সুর ক'রে ব'লে আর গেলাস ঠুকে ঠুকে মদ খায়। যেন ঐ অর্থহীন প্রলাপ তাদের মদ খাবার প্রেরণা জোগাচ্ছে। যেই একজন কোনো অজুহাতে টলতে টলতে বেরিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে নতুন অতিথি ঘরে ঢুকে মিঃ উয়েহারাকে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে দলের মধ্যে ভিড়ে যাচ্ছে।

"উয়েহারা আপনি জানেন আহাহা নামে একটা জায়গা আছে। আচ্ছা বলুন তো কথাটার সঠিক উচ্চারণ কি হতে পারে? আঃ—আঃ—আঃ, না আহাঃ আহাঃ?" যে-লোকটি সামনে ঝুঁকে এই প্রশ্ন করলো তার নাম ফুজিটা, অভিনেতা। আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি তাকে স্টেজে অভিনয় করতে দেখেছি।

"কথাটা হবে আহাঃ—আঃ। ধরো তুমি বললে, আহাঃ—আঃ চিদোরির মদ শস্তা নয়।" বললেন মিঃ উয়েহারা।

একটি মেয়ে ব'লে উঠলো, "আপনার মুখে কেবলই পয়সার কথা।

এক ছোকরা বললো, "এক ফার্দিং-এ দু ঢোঁক, মাগগি না শস্তা হলো?"

আরেক ভদ্রলোক বললেন, "বাইবেলে আছে, তোমার শেষ ফার্দিংটা পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। একজনের পাঁচ টাকা আছে, একজনের আছে দুই, আরও একজনের মাত্র একটি—বাব্বাঃ হিতোপদেশের লম্বা ফিরিস্তি। যীশুর হিসেবের কিন্তু বড্ডো বাড়াবাড়ি ছিলো।"

অন্য একজন বললেন, "আরে তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, তিনি নিজেও মদ খেতেন। বাইবেলে ভর্তি মদের গল্প। যেসব লোক সুরাসক্ত তাদের নিয়ে বাইবেলে অনেক সমালোচনা দেখতে পাবে, কিন্তু যারা মদ খায় তাদের সম্বন্ধে উচ্চ-বাচ্য নেই, অবশ্য খুব যারা আসক্ত তারা ছাড়া। এতে প্রমাণ হয় যীশু নিজে নিশ্চয়ই বেশ মদ খেতেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, উনি এক নাগাড়ে দুই কোয়ার্ট মদ খেতে পারতেন।"

"হয়েছে, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা ধর্মভীরু তারাই যীশুর দোহাই দিচ্ছে। ওসব রেখে মদ চালিয়ে যাও। গিলোটিন, গিলোটিন, স্যু, স্যু, স্যু।" মিঃ উয়েহারা দলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ও অল্পবয়সী মেয়েটির গেলাসের সঙ্গে সজোরে গেলাস ঠুকে মদে চুমুক দিলেন। ঠোঁটের কশ বেয়ে গালের ওপর গড়িয়ে পড়া তরল পদার্থটুকু অসভ্যের মতো হাতের চেটোতে মুছে নিলেন। পরমুহূর্তে পাঁচ-ছয়বার প্রচণ্ড হাঁচি দিলেন।

আমি নিঃশব্দে উঠে পাশের ঘরে গেলাম। ফ্যাকাশে রুগ্ন চেহারার হোটেল কর্ত্রীকে জিগগেস ক'রে কলঘরটা কোথায় জেনে নিলাম। এ ঘর পেরিয়ে দলের কাছে ফিরে যাবো, এমন সময়ে দেখি সেই সুন্দরী অল্পবয়েসী মেয়েটি, চী—মনে হলো আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

মধুর হেসে জিগগেস করল, "খিদে পায়নি তোমার?"

"না, আমার সঙ্গে রুটি আছে।"

দুর্বল চেহারার পূর্বোক্ত মহিলাটি হিটারের ওপর ক্লান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "দেবার মতো বিশেষ কিছু নেই আমাদের। সামান্য যা আছে, তাই দুটি মুখে দেবে এসো। এখানেই একটু খেয়ে নাও। ঐ মাতালদের পাল্লায় পড়লে সারারাত উপোস করেই কাটাতে হবে। এদিকে চী—এর পাশে এসে বোসো।"

পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোকের সাড়া পেলাম, "এই কিনু, এদিকে মদ ফুরিয়েছে।"

কিনু-ঝি "যাই" ব'লে দশ বোতল সাকে একটা ট্রের ওপর বসিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

হোটেল কর্ত্রী ওকে মাঝপথে থামালেন, "এক মিনিটি দাঁড়াও, আমাদের এখানে দু বোতল রেখে যাও।" পরে মৃদু হেসে যোগ দিলেন, "কিনু, তোমায় কিন্তু আর একটু কষ্ট দেবো। সুজুইয়ার কাছ থেকে দু-বাটি নুড্‌ল্‌ নিয়ে এসো। যাবে আর আসবে।"

আমি চী-এর পাশে হিটারের দিকটায় ব'সে হাত শেঁকতে লাগলাম।

"আয়েস ক'রে বোসো, এই নাও কুশন। দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছে না? মদ খাও না তুমি?" মাদাম প্রথমে বোতল থেকে মদ ঢেলে নিজের পেয়ালা ভর্তি করলেন, পরে আমাদের দুজনের পেয়ালাও ভরে দিলেন।

আমরা তিনজনে নীরবে পান করতে লাগলাম। আশ্চর্য অন্তরঙ্গ সুরে কর্ত্রীটি বললেন, "তোমরা দুজনেই মদ খেতে অভ্যস্ত দেখছি!"

সামনে দরজা খোলার শব্দে চেয়ে দেখি এক তরুণ বলছে, "মিঃ উয়েহারা, মালিক এমন কিপটে যে, কিছুতেই বিশ হাজার দিতে রাজী হলো না, কোনোরকমে দশ হাজার বাগিয়ে এনেছি।"

মিঃ উয়েহারা হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করলেন, "চেক ?"

"না, মাপ করবেন, নগদই আছে।"

"ঠিক আছে, আমি একখানা রসিদ দিচ্ছি।"

দলের আর পাঁচজন একটানা "গিলোটিন গিলোটিন, সু, সু, সু" গেয়েই চলেছে। এমন অবস্থা যে কথাবার্তার মাঝেও থামে না।

কর্ত্রীটি বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই চী-কে জিগগেস করলেন, "নাওজি কেমন আছে ?" আমি চমকে উঠলাম। চী-এর গালে লালের ছোপ লাগলো, ইতস্ততঃ ক'রে জবাব দিলো, "কি ক'রে জানবো বলো ? আমি তো ওর মালিক নই !" কর্ত্রী আবার ব'লে চললেন, "মনে হয় সম্প্রতি উয়েহারার সঙ্গে তার কোনো মন-কষাকষি হয়েছে, নইলে দুজনে তো বরাবর একসঙ্গেই থাকেন।"

"শুনেছি আজকাল সে নাচ শিখেছে, সম্ভবত কোনো নাচ-ওয়ালির পাল্লায় পড়েছে !"

"নাওজি বড্ড বেহিসেবি—মদের ওপর মেয়েমানুষ। মিঃ উয়েহারা এইরকম মতলবই করেছিলেন।"

"একেবারে গোল্লায় যাবে ছেলেটা যখন ওর মতো বখা ছেলে একবার এ রাস্তায় পা দিয়েছে—"

ঈষৎ হেসে বাধা দিতে বাধ্য হলাম। চুপ ক'রে শোনা উচিত হবে না মনে ক'রে বললাম, "মাপ করবেন, নাওজি আমার ভাই।"

মাদাম দারুণ অবাক হয়ে আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চী কিন্তু সহজ সুরে বললো, "তোমাদের চেহারায় খুব মিল আছে। তোমায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি এক মিনিটের জন্য চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল নাওজিই বুঝি !"

মাদামের গলার স্বরে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো, "হ্যাঁ, তাইতো ! তাহলে তুমি এই নরকে এলে কেন ? মিঃ উয়েহারার সঙ্গে আলাপ ছিলো বুঝি ?

"হ্যাঁ বছর দুয়েক আগে আমি ওঁকে একবার দেখেছিলাম।" আমার গলা ধ'রে এলো। চোখ নিচু করলাম।

নুড্‌ল্‌ হাতে ঝি এলো, "এতক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, কিছু মনে করবেন না।"

মাদাম আমার দিকে খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "জুড়িয়ে যাবার আগেই খেয়ে নাও।"

"ধন্যবাদ", ব'লে নুড্‌ল্‌-এর ধোঁয়ার মধ্যে মুখ গুঁজে চট্‌পট্‌ খেতে শুরু করলাম। মনে হলো বেঁচে থাকার অসীম দুঃখকে আমি যেন জীবনে এই প্রথম এমন গভীর ভাবে অনুভব করলাম।"

"গিলোটিন্‌, গিলোটিন্‌, সু, সু, সু" গুনগুন করতে করতে উমেহারা এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়ে নীরবে মস্ত একখানা খাম মাদামের হাতে তুলে দিলেন।

খামের ভেতরে কি আছে না দেখেই মাদাম সেটিকে দেরাজে চালান ক'রে দিলেন। হাসি মুখেই বললেন, "ভেবো না এতেই তুমি পার পাবে। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবো না।"

"হবে, হবে। বাকিটা সব সামনের বছর শোধ করে দেবো।"

"এও ঠিক বিশ্বাস করতে বলো?"

দশ হাজার ইয়েন। কত অজস্র বালব কেনা যায় ঐ দামে। ঐ টাকায় আমার মতো মানুষ হেসে-খেলে একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারে।

এই লোকগুলোর কোথায় যেন মস্ত গোলমাল আছে। কিন্তু বোধহয়, আমার ভালোবাসারও যে দশা, এদেরও তাই, নিজেদের খুশিমতো উপায়ে বাঁচতে না পারলে এরা মরে যাবে। একথা যদি সত্যি হয় যে, এ পৃথিবীতে জন্ম নিলে মানুষকে যা হোক করে জীবন কাটিয়ে যেতেই হবে, তাহলে তার বেঁচে থাকার রূপ যতো কদর্যই হোক না কেন, এমনকি তার নিজের মতো কুৎসিত হলেও তাকে

বোধহয় ঘৃণা করা উচিত নয়। শুধু বেঁচে থাকা, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি, এক পর্বত প্রমাণ দায়িত্ব, এ কেবল অনুমান করা যায় মাত্র।

পাশের ঘরে একজনের গলা শোনা গেলো, "যাই হোক, এখন থেকে আমাদের মতো টোকিওর বাসিন্দারা যদি মৌখিক ভদ্রতা মাত্র বজায় রেখে, অত্যন্ত সহজ ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করতে না পারে, তবে ভদ্র-সমাজ শেষ হয়ে যাবে। আজকের দিনে শ্রদ্ধা-সততাদি পুণ্য মানুষের কাছে আশা করা, আর গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলানো লোককে ঠ্যাং ধ'রে টানা একই কথা। শ্রদ্ধা? সততা? বাজে কথা সব। এদের সঙ্গে তুমি বাঁচতে পারো না। জীবনকে হাল্কা ভাবে না নিতে পারলে তিনটে মাত্র রাস্তা খোলা থাকে—গ্রামে ফিরে যাওয়া, আত্মহত্যা করা, অথবা মেয়েদের অনুচর হওয়া।"

আর একজন বললো, "যে হতভাগা এই তিন রাস্তার একটাও নিতে পারে না, তার জন্য শেষ রাস্তা খোলা আছে উয়েহারার কাছে ধার নিয়ে পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে থাকা।"

গিলোটিন, গিলোটিন সু, সু, সু! গিলোটিন, গিলোটিন সু, সু, সু।"

আধচাপা গলায় মিস্টার উয়েহারা জিগগেস করলেন, "এখানে তোমার রাত কাটাবার কোনো ব্যবস্থা নেই বোধহয়, তাই না?"

আমার মনে হলো একটা সাপ নিজেকেই ছোবল দেবার জন্য মাথা খাড়া ক'রে উঠেছে। শত্রুতা। বিজাতীয় ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ শক্ত কঠিন হয়ে উঠলো।

আমার স্পষ্ট রাগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মিস্টার উয়েহারা আবার প্রশ্ন করলেন, "আমাদের সকলের সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারবে? যা ঠাণ্ডা পড়েছে!"

মাদাম বাধা দিয়ে উঠলেন, "না অসম্ভব! তোমার হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ আছে?"

মিঃ উয়েহারা দাঁতের গোড়ায় জিভ ঠেকিয়ে শব্দ করলেন, "সে ক্ষেত্রে ওর এখানে আসাই উচিত হয়নি।"

আমি চুপ ক'রেই রইলাম। তাঁর গলার স্বর আমায় সেই মুহূর্তে বুঝিয়ে দিলো, আমার সব চিঠিই উনি পড়েছেন এবং বাকি সকলের চেয়ে আমার প্রতি দুর্বলতা ওঁর অনেক বেশি।

আবার বললেন, "উপায় কি এখন? ফুকির ওখানে একটা বিছানায় ব্যবস্থা হতে পারে। চী একে সেখানে নিয়ে যাও. কেমন? না, ভেবে দেখলাম দুটি মেয়ের পক্ষে এখন পথে বেরুনো ঠিক হবে না। কী জ্বালা! আমায় নিজেকেই যেতো হলো দেখছি।"

পথে বেরিয়ে বেশ বোঝা গেলো প্রায় মাঝরাত তখন। বাতাসের বেগ প'ড়ে এসেছে। তারারা আকাশ জাঁকিয়ে সভা ডেকেছে। আমরা পাশাপাশি হেঁটে চললাম। আমি বললাম, "অন্যদের সঙ্গে আমিও ঐ ঘরে বেশ শুতে পারতাম।"

মিঃ উয়েহারা ঘুম চোখে ঘোঁৎঘোঁৎ ক'রে উঠলেন।

মৃদু হেসে আমি আবার বললাম—"আপনি চাইছিলেন আমরা দুজনে যাতে একা থাকতে পারি, তাই না?"

বিরক্ত হাসিতে মুখ বিকৃত ক'রে জবাব দিলেন, "তাইতো হয়েছে, যতো জ্বালা!" অত্যন্ত নিবিড়ভাবে—প্রায় মর্মান্তিকভাবে অনুভব করলাম, ভদ্রলোক আমার প্রেমে পড়েছেন।

"আপনি দারুণ মদ খান। রোজ রাতেই কি এমনি চলে?

"প্রতিদিন। ভোর থেকে আরম্ভ হয়।"

"মদ এতো ভালো লাগে?"

"বিকট গন্ধ।"

গলার স্বরে এমন কিছু ছিলো, যা শুনে আমি শিউরে উঠলাম, "আপনার কাজ কেমন চলছে?"

"খুব খারাপ। এখন যা-ই লিখতে বসি, তাই একেবারে

নির্বোধের অর্থহীন প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের গোধূলি, শিল্পের সন্ধ্যা। মানুষের সন্ধ্যা! কী প্রহসন!”

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, “ইউট্রিলো।”

“হ্যাঁ ইউট্রিলো। লোকে বলে ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন। এখন মদ তাঁকে খাচ্ছে। কঙ্কালসার। গত দশবছর যাবত তাঁর ছবি অবিশ্বাস্য রকম অশ্লীল এবং অত্যধিক জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেকটাই তাই।”

“শুধু কি ইউট্রিলোই? বেশির ভাগ প্রতিভাবানেরই আজ এক অবস্থা।”

“হ্যাঁ, তাদের সৃজনী শক্তি হারিয়ে গেছে। কিন্তু নতুন যারা তাদেরও ঐ একই অবস্থা, কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। তুষারাঘাত। যেন অকালে তুষারপাত হয়ে সারা দুনিয়াটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।”

আমার কাঁধের ওপর তাঁর হাত আলতোভাবে রাখা। এ যেন তার গরম আচ্ছাদনের অন্তরালে আমায় রক্ষা করার প্রয়াস। একে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি আমার কই? ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে যেতে তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ঘনীভূত ক'রে আনলাম।

পথের পাশে গাছগুলি শাখা মেলে আছে। সম্পূর্ণ রিক্ত সরু-সরু তীক্ষ্ণ ঋজু ডালগুলো যেন আকাশকে ফুঁড়ে দিচ্ছে। “ভারি সুন্দর ডালগুলি, না?” নিজের মনেই বলে ফেললাম।

কেমন যেন বিভ্রান্ত সুরে প্রশ্ন করলেন, “তুমি বলতে চাও এই কালো কালো ডালদের সঙ্গে ফুলেদের মিতালির কথা—তাই না?”

“না ফুল, পাতা, কুঁড়ি কোনোটাই না। আমি ভালোবাসি গাছের ডাল। সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থাতেও তারা প্রাণরসে সিক্ত। মরা ডালের সঙ্গে এদের কতো তফাত।”

“অর্থাৎ তুমি বলতে চাও একমাত্র প্রকৃতির প্রাণরসের ভাণ্ডার

এখনও পরিপূর্ণ আছে—এই তো ?" বলতে গিয়ে ভদ্রলোক কয়েকটা প্রচণ্ড হাঁচি দিলেন।

"আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে ?"

"না, তা নয় ; আমার মদের নেশা যখন চরমে ওঠে, তখন এমনি হাঁচি। এটা যেন আমার মাতাল হবার পরিমাপ যন্ত্র।"

"আর প্রেমের ?"

"মানে ?"

"তেমন কেউ আছে কি ? এমন কেউ যে আপনার অনুরাগের শিখরে উঠেছে ?"

"আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। মেয়েরা সব সমান—এমন জটিল তাদের চরিত্র। গিলোটিন, গিলোটিন, সু-সু-সু। বাস্তবিকই তেমন একজন আছে, না ঠিক, একজন নয়, আধজন আছে।"

"আমার চিঠিগুলো পড়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার কাছ থেকে কি ধরনের উত্তর আশা করতে পারি ?"

"আসলে বনেদি চাল আমি পছন্দ করি না। সব ব্যাপারেই তাদের কেমন যেন উদ্ধত নাকউঁচু ভাব। সেদিক থেকে তোমার ভাই নাওজি যথেষ্ট শুধরেছে ; কিন্তু সে-ও মাঝে মাঝে এমন ঢঙ করে যে আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি চাষার ছেলে, এরকম ছোট্টো নদীর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। সেই গাঁয়ের পুকুরে রুপোলি মাছ ধরার কথা। ছোট্টো নদীতে জাল ফেলে পুঁটিমাছ ধরার কথা—আর অমনি বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে।"

অন্ধকারে অস্ফুট শব্দ ক'রে বয়ে চলেছে একটা ছোট্টো নদী, আমরা তারই পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম।

"তোমরা অভিজাতেরা শুধু যে আমাদের দুঃখ বোঝো না তাই নয়, উপরন্তু ঘৃণা করো।"

"তাহলে টুর্গেনিভকে কি বলতে চান?"

"সেও তোমাদের মতো বড়লোক, তাই ওঁর ওপর আমার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা আছে।"

"তাঁর 'স্পোর্টসম্যান্স্ স্কেচেস' বইটাও?"

"হ্যাঁ, ওঁর ঐ একটা বই মন্দ হয়নি বলা যায়।"

"গ্রাম-জীবনের বেদনায় ভরা ঐ বইখানি।"

"বেশ মানলাম, সে ভদ্রলোক গ্রাম্য অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, এবার হলো তো?"

"আমিও গ্রামের মেয়ে, আমি জমি চাষ করি, একেবারে গরিব গেঁয়ো মেয়ে।"

"তুমি কি এখনও আমায় ভালোবাসো?" এবার তাঁর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে এলো, "এখনও কি আমার কাছে সন্তান চাও?"

একথার উত্তর দিলাম না।

পাহাড়ে যেমন ধ্বস নামে, তেমনি হঠাৎ তাঁর মুখখানা আমার মুখের ওপর নেমে এলো—আমায় প্রচণ্ডভাবে চুম্বন করলেন। সেই চুম্বনের মধ্যে তীব্র কামনার আভাস। ঐ চুম্বন গ্রহণ করতে গিয়ে আমার চোখে জল এলো। গভীর লজ্জায়-আত্মগ্লানিতে সে কান্না আমার অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করে চোখের ভেতর দিয়ে বন্যার মতো নেমে এলো।

পাশাপাশি চলতে চলতে তিনি বললেন, "ব্যাপারটা কেমন তাল-গোল পাকিয়ে ফেললাম—দেখছি তোমার প্রেমে মজে গেছি।" নিজের মনেই হেসে উঠলেন।

আমার কিন্তু একটুও হাসি এলো না, ভ্রূ কুঞ্চিত, অধর স্ফুরিত হলো। আমার সে সময়ের মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করলে এই

দাঁড়ায়—অগত্যা। বুঝতে পারলাম, আমি যেন অন্ধকারের ভেতর একা চলেছি।

ভদ্রলোক আবার বললেন, "সবটা কেমন গোলমাল ক'রে ফেলেছি। কি বলো, মহলা চলবে?"

"থাক আর ঢঙ করতে হবে না।"

"শয়তান!" মিঃ উয়েহারা আমার কাঁধে এক মৃদু চাপড় দিলেন তারপরেই এক বিরাট হাঁচি। মিঃ ফুকির বাড়িতে বোধহয় সবাই শুয়ে পড়েছে।

"টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম! মিঃ ফুকি, টেলিগ্রাম এসেছে।" উয়েহারা চেঁচামেচি ক'রে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

"কে? উয়েহারা নাকি?" পুরুষ কণ্ঠের সাড়া পেলাম।

"ঠিক ধরেছো, রাজপুত্র ও রাজকন্যা এসেছে এক রাতের আশ্রয়ের আশায়। বাইরে এতো শীত যে হাঁচতে-হাঁচতে প্রাণ বেরিয়ে গেলো এতো কষ্টের প্রেমের অভিসার শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হ'তে চলেছে।"

সদর দরজা খুলে গেলো। টেকো মাথার জমকালো এক পাজামা পরা বছর পঞ্চাশেক বয়সের বেঁটেখাটো ভদ্রলোকটি কেমন লাজুক হাসি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

মিঃ উয়েহারা কোট না খুলেই ঘরে ঢুকে শুধু বললেন, "কিছু মনে করো না, তোমার স্টুডিও ঘরখানা বড্ডো ঠাণ্ডা। দোতলার ঘরটা আমার চাই। চলে এসো।" ব'লে আমার হাত ধ'রে হলঘরের প্রান্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকলাম। উয়েহারা সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললেন।

আমি বললাম, "ঠিক যেন কোনো হোটেলের নিরিবিলি খাবার ঘর তাই না?"

"ভুঁইফোঁড়ের রুচি আর কতোই বা ভালো হ'বে। তবু ফুকির মতো বাজে মার্কা আর্টিস্টের পক্ষে এও যথেষ্ট ভালো। ভাগ্য যখন তোমার সহায়, তখন আর পাঁচজনের মতো পতনের ভয় তোমার থাকে না। এই সব লোকেদের ঘাড় ভাঙাই উচিত। যাই হোক শুয়ে পড়ো এখন, শুয়ে পড়ো।"

এ যেন ওঁর নিজের ঘর-বাড়ি এমনিভাবে আলমারি থেকে বিছানাপত্র টেনেটুনে বের করলেন। "তুমি এখানে ঘুমোও। আমি তবে আসি। কাল সকালে এসে তোমায় নিয়ে যাবো। নীচে নেমে ডান হাতে কলঘর পাবে।" সিঁড়ি দিয়ে এমন প্রচণ্ড শব্দ ক'রে নেমে গেলেন মনে হলো যেন গড়িয়ে পড়েই গেলেন বুঝি! ব্যস্ ঐ পর্যন্ত। এর পর চারদিক নিস্তব্ধ নিশুতি।

আলো নিবিয়ে কোটটা খুলে কিমনো পরেই বিছানায় ঢুকে পড়লাম। এই কোটের ভেলভেট কাপড়খানা বাবা একবার বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এনেছিলেন। রেশমি কোমরবন্ধটা শুধু ঢিলে ক'রে নিলাম। ক্লান্তির মুখে মদ খেয়ে শরীরটা ভারি হয়েই ছিলো। সহজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কোন সময়ে ঠিক মনে নেই, চোখ মেলেই দেখি ভদ্রলোক আমার পাশে শুয়ে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলাম।

হঠাৎ ওর জন্য কেমন যেন মায়া হলো, আত্মসমর্পণ করলাম।

"আপনি যেভাবে জীবন যাপন করছেন, তাই কি আপনার একমাত্র সান্ত্বনা?"

"প্রায় তাই।"

"কিন্তু এতে আপনার শরীর খারাপ হয় না? আমার ধারণা আপনার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে।"

"কি ক'রে বুঝলে ? সত্যি বলতে কি, সেদিন সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি, অবশ্য একথা কেউ জানে না।"

"মায়ের মৃত্যুর আগে এমনি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম।"

"জীবনে হতাশ হয়ে আমি মদ ধরেছি। জীবন এতো নৈরাশ্যময় যে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ। এই দুঃখময় সঙ্গীবিহীন শিথিল জীবন আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে। তোমার চারপাশের দেওয়াল থেকে যখন হাহাকার ওঠে তখন ধ'রে নিতে পারো শুধু তোমার জন্য এ দুনিয়াতে কোনো সুখ থাকতে পারে না। মানুষ যখন উপলব্ধি করে দুনিয়াতে বেঁচে থেকে আর কোনদিনই যশ বা সুখের মুখ দেখতে পাবে না, তখন তার কি অবস্থা হয় বলতে পারো ? প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম! হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। লাভ কি তাতে ? শুধু ক্ষুধার্ত পশুর মুখে অন্ন জোগানো। অনুকম্পার যোগ্য মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে এতো বেশি !—বলো এ-ও অভিনয় ?"

"না।"

"শুধু আছে ভালোবাসা। ঠিক যেমনটি তুমি লিখেছিলে।"

"হ্যাঁ।"

আমার প্রেমের বাতি নিভে গেলো।

ঘরে যখন আবার মৃদু আলো হলো, আমি দেখলাম সেই ঘুমন্ত মানুষের চেহারা। তার মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। একেবারে ক্লান্ত।

এ মুখ বলির পশুর। এক অমূল্য উৎসর্গ!

আমার মনের মানুষ। আমার রামধনু। আমার শিশু। ঘৃণ্য পুরুষ। ব্যভিচারি পুরুষ।

মনে হলো এমন সুন্দর মুখের তুলনা সারা পৃথিবীতে নেই। নতুন ক'রে জেগে ওঠা প্রেমের উত্তেজনায় আমার বুক কেঁপে উঠলো। তার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি তাকে চুম্বন করলাম।

প্রেমের বিষণ্ণ, অতি বিষণ্ণ পরিসমাপ্তি।

চোখ বন্ধ রেখেই উয়েহারা আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। "আমি আগাগোড়াই ভুল করেছি। চাষার ছেলের কাছে এর বেশি কি আশা করতে পারো?"

এরপর ওকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

"এতোদিনে আমি সুখী। যদি চারপাশের দেয়াল ভেদ ক'রে হাহাকার ওঠেও তবু আমার সুখের মাত্রা চরমেই থাকবে। আনন্দে আমার হাঁচতে ইচ্ছে করছে।"

উয়েহারা হাসলেন, "কিন্তু বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।"

"সবে ভোর হয়েছে।"

সেদিন সকালেই আমার ভাই নাওজি আত্মহত্যা করে।

সপ্তম অধ্যায় | শেষ কথা

নাওজির শেষ কথা :

কাজুকো।

কোনো লাভ নেই। আমি চললাম।

কেন যে আমাকে বাঁচতে হবেই, তার কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

যারা বাঁচতে চায়, তারাই শুধু বেঁচে থাক।

মানুষের বেঁচে থাকার যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি মরে যাবার স্বাধীনতাও থাকা উচিত।

আমার এ ভাবনায় নতুন কিছু নেই: আসলে মান্ধাতার আমলের এই স্বাভাবিকের প্রতি মানুষের একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে, যার ফলে এর মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না।

যারা বাঁচতে চায়, শত বাধা সত্ত্বেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। এটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয়, আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে মানব জন্মের গৌরব বলতে যা বোঝায়, তা এই-ই। কিন্তু এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ যে, মরে যাওয়াটা পাপ নয়।

আমার মতো কিশলয়ের পক্ষে এ পৃথিবীর আলো-বাতাসে প্রাণ বাঁচানো শক্ত। কোথায় যেন কিসের একটা অভাব আছে, যেটা থাকলে আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হতো। আমার মধ্যে অপূর্ণতা রয়েছে। অনেক চেষ্টা ক'রে তবে এতোদিন বেঁচে ছিলাম।

হাই স্কুলে ভর্তি হবার পর আমি যখন প্রথম আমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা ডানপিটে ছেলেদের পাল্লায় পড়লাম, তখন তাদের উদ্দামতা থেকে রেহাই পাবার জন্য নেশা শুরু করি। আধো নেশার ঘোরে আমি তাদের প্রতিরোধ করতাম। পরে ফৌজে ভর্তি হয়ে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন স্বরূপ আফিং ধরি। আমার তখন কি অবস্থা বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারো না—তাই না?

স্থূল, শক্ত, না—নৃশংস হতে চাইলাম আমি। ভাবলাম, ঐ একটি মাত্র রাস্তায়

আমি নিজে আর "পাঁচজনের বন্ধুত্ব" দাবি করতে পারি। শুধু মদে ঠিক সুবিধে হলো না। সারাক্ষণ মাথা ঘুরতো। সেইজন্য নিরুপায় হয়ে আফিং ধরলাম। আমাকে বংশমর্যাদা ভুলে যেতে হলো। পিতৃরক্ত অস্বীকার করতে হলো মায়ের দাক্ষিণ্যকে প্রত্যাখ্যান করতে হলো। বোনের প্রতি উদাসীন হলাম। ভাবলাম এ ছাড়া পাঁচজনের মধ্যে ঠাঁই মিলবে না।

আমি অমার্জিত হয়ে উঠলাম। অভব্য ভাষা রপ্ত হলো। কিন্তু এর অর্ধেকটা না শতকরা ষাট ভাগই ছিলো ভান, অভিনয়, শস্তা চাতুরি মাত্র। সাধারণ লোকের সঙ্গে এমন উদ্ধত ব্যবহার করতাম, যে তারা আমার চালিয়াতিতে ক্ষেপে উঠতো। আমার সঙ্গে কখনো তারা সহজভাবে মেশেনি। অন্যদিকে যেসব জ্ঞানী গুণীদের আড্ডা আমি একদিন স্বেচ্ছায় বর্জন করেছি, সেখানে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। আমার স্বভাবের এই রুক্ষতার ষাটভাগ আরোপিত হ'লেও বাকি চল্লিশ ভাগ খাঁটি। উচ্চশ্রেণীর অসহ্য শিষ্টাচারগুলো দেখে আমার গা গুলিয়ে আসে, এক মিনিটও বরদাস্ত হয় না। সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজের তথাকথিত শীর্ষস্থানীয় যাঁরা, তাঁরা আমার বেয়াদব চালচলনে অসহ্য হ'য়ে আমাকে একঘরে করবেন। যে দুনিয়া আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে এসেছি, সেখানে আবার ফিরে যাওয়া চলে না, আর "সাধারণদের" মধ্যে (তাদের মুখে মধু মনে বিষ জাতীয় ভদ্রতা সত্ত্বেও) আমার ঠাঁই দর্শকদের সারিতে।

একথা হয়তো সত্যি যে সব সমাজেই আমার মতো ক্ষীণজীবী দু-চারজন রয়েছে, যাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তার কারণ তাদের নিজেদের চিন্তাধারা অথবা অন্য কিছু নয়, তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। আমার অবশ্য দেবার মতো কিছু কৈফিয়ত রয়েছে। পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায় আমার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন।

সব-মানুষই সমান।

ভেবে অবাক লাগে এটাও একটা দর্শন। যিনি এই অসাধারণ উক্তিটি করেছিলেন তিনি একজন দার্শনিক, ধর্মনিষ্ঠ বা শিল্পী এ-কথা মানতে আমি রাজী নই। কথাটা কোনো তাড়িখানায় বিশেষ কেউ বলতেই চালু হ'য়ে গিয়েছিল এবং তখন থেকেই কথাটির নিয়তি নির্ধারিত। বিশ্বসংসারটাকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে ঘৃণ্য একটা স্থানে পরিণত করাই এর উদ্দেশ্য।

এই অদ্ভুত প্রত্যয়ের সঙ্গে গণতন্ত্র অথবা মার্কসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সন্দেহ নেই তাড়িখানায় কোনো কুৎসিত লোক, জনৈক রূপবানকে এই কথা বলেছিলো। এর মূলে ছিলো বিরক্তি, কিংবা বলতে পারো ঈর্ষা—কিন্তু আদর্শ বা তেমন কিছুর প্রতি এর আদৌ লক্ষ্য ছিলো না।

কিন্তু সাধারণ এক তাড়িখানায় হিংসের জ্বালায় যে মন্তব্যের সূত্রপাত, ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে সগৌরবে সেটা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে মতবাদের রূপ নিলো। গণতন্ত্র বা মার্কসবাদের সঙ্গে যে মন্তব্যটির স্পষ্টতই কোনো সম্পর্ক ছিলো না দেখতে-দেখতে তা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সূত্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অবিশ্বাস্যরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো।

আমার মনে হয় স্বয়ং মেফিস্টোও এহেন উক্তিকে মতবাদে পরিণত করার আগে বিবেক দংশনে কিছুটা ইতস্তত করতেন।

সব মানুষই সমান।

কতো হীন মন্তব্য। এ উক্তির নিজস্ব গ্লানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা মানুষের অধঃপতন, সব গর্বের অবসান, সব উদ্যমের উচ্ছেদ। মার্কসবাদ শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে, কিন্তু একথা বলে না যে, সব মানুষই সমান। গণতন্ত্র ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করে, কিন্তু এ কথা বলে না যে, সব মানুষই সমান। অপদার্থ শুধু একথা বলবে যে যতোই বড়াই করুক না কেন সে আর সকলের সঙ্গে সমান।

কেন সমান? "শ্রেষ্ঠতর" বলতে পারে না? এই হলো দাস-মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া!

অত্যন্ত অশালীন ও ঘৃণ্য এই উক্তি। আমার ধারণা এ যুগের "তথাকথিত যাবতীয় উৎকণ্ঠা" মানুষ সম্পর্কে মানুষের সংশয়, চিরাচরিত আদর্শের অবমাননা, যে কোন উদ্যম সম্পর্কে উপহাস সুখের বঞ্চনা, সৌন্দর্যের অপমান, সম্মানের হানি—সব কিছুর মূলে রয়েছে ঐ অবিশ্বাস্য অভিব্যক্তিটি।

একথা স্বীকার করতে হয় যে ঐ উক্তির কদর্যতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না। এবং আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলাম। মর্মাহত, বিব্রত হয়ে আমি সারাক্ষণ উদ্বেগে কাটাতাম এবং সকল প্রয়াস ব্যর্থ হতো। মদ এবং বিষাক্ত মাদক দ্রব্যের গুণে যে ক্ষণিকের বিশ্রাম পেতাম তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সব গোলমাল হয়ে গেলো।

আমি দুর্বল একথা সত্যি। কোথায়ও একটা গুরুতর অভাব আছে। আমি যেন শুনতে পাই কে এক জংলি বুড়ো ঘেন্নায় ঠোঁট বেঁকিয়ে আমার বিষয় বলছে, "এতো মাথা ঘামাবার কি আছে? সবাই জানে ছেলেবেলা থেকেই ও একটা কুঁড়ে কামুক, স্বার্থপর, নষ্ট ছেলে।" এখন পর্যন্ত লোকমুখে এ মন্তব্য শুনে অপ্রস্তুত হয়ে মাথা হেঁট করেছি, কিন্তু আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কাজুকো।

লক্ষ্মীটি আমায় বিশ্বাস করো।

আমোদ-আহ্লাদে কখনো তৃপ্তি পাইনি। সম্ভবত এ থেকে আনন্দের অসারতাই প্রমাণিত হয়। আমি বনেদি ঘরের ছেলে—এই আমির ছায়া থেকে পালিয়ে বেড়াবার আশায় নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ডুবে থাকতাম।

জানি না এর জন্য বাস্তবিক আমাদের দায়ী করা যায় কিনা। বড়ো বংশে জন্মেছি, সে কি আমাদের দোষ? কেবল উচ্চবংশে জন্মেছি বলেই কি ইহুদীদের মতো সারা জীবন আমাদের মাথা নিচু ক'রে সসঙ্কোচে, করজোড়ে অপমানের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হবে?

আরো আগেই মরা উচিত ছিলো। কিন্তু সবার ওপর একটি জিনিস ছিলো: মায়ের ভালোবাসা। সেকথা মনে ক'রে আমার এতোকাল মরা হয়নি। আমি আগে যেকথা বলেছি, মানুষের বাঁচার যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি খুশিমতো মরার স্বাধীনতাও আছে। তবুও মা যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন স্বেচ্ছামৃত্যুকে জোর ক'রে দূরে ঠেলে রেখেছিলাম, কারণ জানতাম আমার ইচ্ছা পূর্ণ করা মানে মায়ের মৃত্যু ডেকে আনা।

এখন আমি জানি যে আমার মৃত্যুতে কেউ এতোখানি শোক পাবে না যাতে তার শারীরিক ক্ষতি হ'তে পারে। না, কাজুকো তোমার কতো কষ্ট হবে তা আমি জানি! আমার মৃত্যুসংবাদে তুমি কাঁদবে ঠিকই—তোমার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আবেগের কথা বাদ দিয়ে—লক্ষ্মী বোনটি আমার—ভেবে দেখো ঘৃণ্য জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার যে আনন্দ তাকেই আমি স্বেচ্ছায় বরণ করছি। একথা ভেবে তুমি সান্ত্বনা পাবে।

যে-ব্যক্তি অনুকম্পাভরে আমার আত্মহত্যার প্রতি কটাক্ষ ক'রে (সাহায্যের জন্য না এগিয়েই) মন্তব্য করবেন যে, জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত আমার

বেঁচে থাকাই উচিত ছিলো, তিনি মহামানব, স্বয়ং সম্রাটকেও একটা ফলের দোকান খোলার পরামর্শ দেবার সময় তাঁর গলা কাঁপবে না।

কাজুকো।

আমার মরাই ভালো। বেঁচে থাকার ক্ষমতা আমার নেই। অর্থের জন্য মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করার শক্তি আমার নেই। লোকের কাছে হাতপাতা আমার দ্বারা হবে না। এমন কি উয়েহারার সঙ্গে যখনই মদ খেতে গিয়েছি, আমার ভাগের দাম আমি সব সময় নিজেই দিয়েছি। এইজন্য ভদ্রলোক আমায় ঘৃণা করতেন এবং বলতেন, এ হলো শস্তা বড়োলোকি চাল, আমি কিন্তু অহঙ্কারের বশে এ কাজ করিনি। তার উপার্জিত অর্থে মদ খেতে বা মেয়েমানুষকে নিয়ে ফুর্তি করতে আমার ভয় হতো। মুখে বলতাম, মিঃ উয়েহারার লেখার প্রতি সম্মান দেখানোই আমার উদ্দেশ্য, আসলে সেকথা মিথ্যে, কেন যে এরকম করতাম আমি নিজেই জানি না। শুধু বুঝতাম অপর কেউ আমার হয়ে দাম দিলে অস্বস্তি লাগে। বিশেষত অপর কোনো ব্যক্তির কষ্টার্জিত অর্থে আমোদ-আহ্লাদ করতে আমার রীতিমতো ঘৃণা হয়।

আমার নিজের ঘর থেকে টাকা নিয়ে মাকে ও তোমাকে দারুণ অর্থকষ্টে ফেলে রেখে ফুর্তি করেও একতিল সুখ পাইনি। আমার এই অস্বস্তির অবস্থা গোপন করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ-ভবনের কথা বলতাম—নতুবা মন থেকে আমার আদৌ এ ধরনের কোনো সদিচ্ছা হয়নি, শত নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও এটুকু বুঝতাম যে-ব্যক্তি এক গেলাস মদ পর্যন্ত পরের পয়সায় খেতে পারে না তার দ্বারা আর যাই হোক ব্যবসা করা চলবে না, সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা।

কাজুকো।

আমারা গরিব হয়ে গেছি। আমাদের যখন অবস্থা ভালো ছিলো, তখন সর্বদা অপরের জন্য খরচ করতে ইচ্ছে হতো, কিন্তু এখন আমাদের খরচ অপরকে চালাতে হবে।

কাজুকো।

যা ঘটে গেছে তারপরও কেন আমায় বাঁচতে হবে? কোনো অর্থ হয় না। আমি মরবোই। আমার কাছে একটা বিষ আছে যা খেলে মরবার

সময়ে কোনো যন্ত্রণা হয় না। ফৌজে চাকরি করার সময়ে এই বিষ আমার হাতে আসে, সেই থেকে একে আমি হাতছাড়া করিনি।

কাজুকো, তুমি সুন্দরী (বরাবর আমার সুন্দরী মা-বোনের জন্য আমার মনে মনে অহঙ্কার ছিলো), বুদ্ধিমতীও বটে। তোমাকে নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তা করার ক্ষমতাও আমার নেই। দস্যু তার শিকারের দুর্গতিতে যেরকম সহানুভূতি দেখায়, আমি শুধু তার মতো লজ্জা পেতে পারি মাত্র আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি বিয়ে করবে, তোমার সন্তানাদি হবে এবং স্বামীর ভেতর দিয়ে তুমি নবজীবন লাভ করবে।

কাজুকো।

আমার একটা গোপন কথা আছে।

বহুকাল একে আমি গোপন করেছি। এমন কি যুদ্ধে গিয়েও আমি সেকথা ভুলিনি। সেখানেও তাকে স্বপ্ন দেখতাম কতবার ঘুম ভেঙে টের পেয়েছি যে ঘুমের মধ্যে আমি কেঁদেছি, তার ইয়ত্তা নেই।

কারো কাছে তার নাম আমি করতে পারবো না, কিন্তু এখন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে, আমার বোনকে, একথা জানানো প্রয়োজন মনে করছি। কিন্তু আজও দেখছি তার নাম করতে আমার দারুণ আতঙ্ক! তবু মনে হয় যদি আমার কথা বাইরের জগতের কাছ থেকে গোপন ক'রে বুকে চেপে মরি, তবে কবরের নীচে আমার পাঁজরের ভেতরটা আধঝলসানো স্যাতসেঁতে থেকে যাবে। একথা ভেবে এতো অশান্তি পাই যে তোমাকে—শুধু তোমাকেই, একথা ব'লে যাবো তাও এমন খাপছাড়াভাবে, প্রথম পুরুষে ব'লে যাবো যাতে মনে হয় আর কারও বিষয়ে গল্প বলে চলেছি। গল্পের মতো বললেও অনায়াসেই ধরতে পারবে কার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। ঠিক গল্প না ব'লে, একে ছদ্মনামের সূক্ষ্ম আবরণও বলা চলে।

কে জানে, তুমি জানলেও জানতে পারো।

আমার ধারণা চোখে না দেখলেও তুমি তার কথা জানো। তোমার চেয়ে সে সামান্যই বড়ো হবে। তার চোখ দুটি বাদামের আকারের খাঁটি জাপানী ভাবের, তার সুদীর্ঘ চুলের ভার (কখনও কৃত্রিম উপায়ে কোঁকড়ানো হয়নি) সেকেলে জাপানীকায়দায় শক্ত ক'রে মাথার পেছনে টেনে বাঁধা। পোশাক অত্যন্ত খেলো, কিন্তু ধবধবে পরিষ্কার, এবং অতি পরিপাটি ক'রে পরা। পরপর কতগুলি ছবি

নতুন রীতিতে এঁকে যুদ্ধের পর এক মাঝ-বয়েসি চিত্রকর হঠাৎই নাম ক'রে ফেলেন—মহিলাটি তারই স্ত্রী। চিত্রকরটি অতি লম্পট বর্বর স্বভাবের মানুষ, কিন্তু স্ত্রীর স্বভাব অতি শান্ত ও মধুর। হতভাগিনীকে দেখে মনে হয় স্বামীর দুর্ব্যবহার তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না, এমন একটি মৃদু হাসি ঠোঁটের কোণে লেগেই থাকে।

সেদিন আমি উঠে দাঁড়িয়ে যেই বলেছি, "এবার তবে আসি।"

দেখি সেও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠস্বর অবিচলিত শান্ত। অসঙ্কোচে মুখের দিকে চেয়ে জিগগেস করলো, "কেন?" মাথাটি একপাশে ঈষৎ হেলিয়ে অকৃত্রিম সন্দেহভরে সোজা চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো। তার চোখে না ছিলো বিদ্বেষ, না ছিলো আত্মগোপনের প্রয়াস। সাধারণত তার চোখে চোখ পড়লে আমি সসঙ্কোচে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে গেলো। প্রায় ষাট সেকেণ্ড বা তার চেয়েও বেশি সময়, তার মুখের মাত্র একফুট দূরে থেকে সেই অপরূপ দুটি চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে কোন এক অসীম সুখ-সাগরে ডুবে গেলাম। শেষ পর্যন্ত স্মিত হেসে বললাম, "কিন্তু..."

তার মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া নেমে এলো, "ওঁর আসার সময় হলো।"

হঠাৎ মনে হলো এই মুখের ভাবে যে অপূর্ব বস্তু পাওয়া গেলো তাকেই হয়তো লোকে সততা সংজ্ঞা দিয়ে থাকে। জানি না সততা কথাটির যথার্থ অর্থ কি। নীতিগন্ধমাখা কঠিন, কঠোর পুঁথিগত ব্যাখ্যামূলক, না এই অপরূপ মুখাভিব্যক্তির মতোই পরম মধুর কিছু একটা।

"আমি আবার আসবো।"

"আসবেন।"

আগাগোড়া আমাদের কথাবার্তা একেবারেই অবান্তর ছিলো। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় আমি চিত্রকরের বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি নেই, যে কোনো মুহূর্তে তার এসে পড়ার কথা। তাঁর স্ত্রী আমায় অপেক্ষা করতে বললেন, আমি আধঘণ্টা বসে-বসে পত্রিকার পাতা ওল্টালাম। এর পরেও যখন দেখলাম ওঁর ফেরার কোনো লক্ষণ নেই, তখন আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার অবকাশমাত্র,

ব্যস তার বেশি কিছু নয়, কিন্তু এরই মধ্যে সেদিন তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মরণ হলো।

সে চোখের ভাষায় এমন কিছু ছিলো যাকে "মহত্ত্ব" বললেও বেশি হবে না। আমি শুধু জোর গলায় বলতে পারি যে, আমাদের মাকে বাদ দিয়ে যে-অভিজাত সমাজে আমরা বাস করি তাদের একজনের মধ্যেও সততার এরকম অকৃত্রিম অভিব্যক্তি সম্ভব নয়।

এরপর আর-এক শীতের সন্ধ্যায় তার পাশফেরানো মুখের সৌন্দর্যে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। সেদিন সকাল থেকে শিল্পীর ঘরে মদ খেতে-খেতে তথাকথিত জাপানী সংস্কৃতির ধ্বজাধারী সমাজকে গালাগালি দিয়ে হৈ চৈ হাসি-ঠাট্টায় ডুবেছিলাম। একটু পরে শিল্পী ঘুমিয়ে পড়ে প্রচণ্ড নাক ডাকাতে লাগলেন। আমারও তন্দ্রা আসছিলো, এমন সময়ে কে যেন আমার গায়ের ওপর একখানা কম্বল ছুঁড়ে দিলো। আমি আধখানা চোখ খুলে দেখি সে মেয়ে কোলে জানলার ধারে ব'সে তন্ময় হয়ে টোকিওর আকাশে শীতের নীল রং ধরা দেখছে। দূর নীলিমার পটভূমিতে তার পরিচ্ছন্ন নিখুঁত মুখের ছায়া রেনেসাঁস যুগে ছবির মতো অপূর্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার গায়ে কম্বলটি ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে ছলাকলা বা কামনা-বর্জিত মমতার স্পর্শ পেলাম। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে "মানবতা" শব্দটি ব্যবহার করলে ভুল হতো না। কি সে করেছে সে সম্বন্ধে নিজেই সে সচেতন নয়। শুধু একটি মানুষের প্রতি দরদের প্রকাশ মাত্র, তারপর বাইরে শান্ত আকাশের দিকে চেয়ে ছবির মতো স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে।

আমি চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আমার সারা দেহে ভালোবাসা আর বাসনার ঢেউ বয়ে গেলো। চোখের পাতা ছাপিয়ে কান্না ঝরে পড়লো। আমি কম্বল টেনে মাথা চাপা দিলাম।

কাজুকো।

প্রথম-প্রথম আমি যখন শিল্পীর বাড়ি যেতাম, কেননা তাঁর কাজের নিজস্ব শৈলী এবং দুরন্ত আবেগ আমায় সম্মোহিত করেছিল। কিন্তু ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হবার পর তাঁর শিক্ষার অভাব, দায়িত্বহীনতা, তাঁর অপরিচ্ছন্নতায় আমার মোহভঙ্গ হয়েছিলো। অন্যদিক থেকে তাঁর স্ত্রীর অন্তরের অপূর্ব মাধুরী আমায় দুর্বার বেগে টানতে লাগলো। না, ঠিক তা নয়, প্রকৃত ভালোবাসায় পূর্ণ এক

নারীকে আমি ভালোবাসতে শিখলাম। শুধু একবার চোখের দেখা হবে তার সঙ্গে, এই আশায় আমি শিল্পীর বাড়ি যেতাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই চিত্রকরের ছবির মধ্যে যেটুকু মাধুর্যের আভাস পাওয়া যায় সেটা শুধু তাঁর স্ত্রীর সুকুমার চরিত্রের ছায়ামাত্র।

এবার আমি এই চিত্রকর সম্বন্ধে আমার মনের খাঁটি ধারণা কি তাই বলছি। এই মাতাল, লম্পট চিত্রকর অতি ধূর্ত ব্যবসায়ী। যখন তাঁর টাকার দরকার হয় তখন যাহোক কিছু এঁকে নিজেকে মস্ত শিল্পী ব'লে লোকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে মানুষের সাময়িক হুজুগের সুযোগ নিয়ে চড়া দামে বাজারে চালিয়ে দেন। গুণের মধ্যে আছে তাঁর চাষাড়ে নির্লজ্জতা, অর্থহীন আত্মবিশ্বাস এবং ধূর্ত ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তি।

বিদেশী বা জাপানী চিত্রকরদের অঙ্কন-পদ্ধতি সম্বন্ধে ভদ্রলোকের হয়তো কোনো ধারণাই নেই এবং নিজেও কি যে আঁকেন তাও হয়তো ঠিক বোঝেন না। মোট কথা, টাকার টান পড়লে ভদ্রলোক পাগলের মতো ক্যানভাসে রং-এর টান দেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জঘন্য ছবিগুলো সম্বন্ধে ভদ্রলোকের মনে আদৌ কোনো দুশ্চিন্তা, লজ্জা বা ভয় নেই। উল্টে তা নিয়ে মনে মনে হামবড়া ভাব আছে। নিজেই যদি ভদ্রলোক নিজের কাজ না বোঝেন, তবে অপরেরটা বুঝে ফেলবেন, এ আশাও তো করা যায় না। বোঝা দূরে থাক ভদ্রলোক শুধু অন্য লোকের কাজে খুঁত ধরে বেড়ান আর গালমন্দ করেন।

মোটকথা অবক্ষয়ের মধ্যে দুরূহ জীবন-যাপন করতে হচ্ছে বলে পাড়া ফাটিয়ে আক্ষেপ ক'রে বেড়ানো ভদ্রলোকের স্বভাব। কিন্তু বাস্তবিকই তিনি গেঁয়ো ভূত ছাড়া আর কিছুই নন, যিনি বড়ো শহরে এসে আশাতীত সাফল্যে একেবারে গদগদ। তাঁর আত্মম্ভরিতা এমন চরমে পৌঁছেছে যে একটির পর একটি ক'রে সংসারের সব রস চেখে বেড়াচ্ছেন।

একবার আমি তাঁকে বলেছিলাম, "যখন আমার সব বন্ধুরা ফুর্তি মেরে বেড়ায় তখন একা বসে পড়াশুনা করতে এতো অস্বস্তি আর ভয় করে যে, কিছুই এগোতে চায় না। সেইজন্য ইচ্ছে না থাকলেও ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে যেতে হয়।"

মাঝবয়েসি শিল্পী ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "কি বললে? বুঝেছি একেই বোধহয়

বলে আমিরী মেজাজ। শুনে আমার গা জ্বলে যায়। কয়েকজন লোক মিলে হল্লা করছে দেখলে আমার মনে হয়, না জানি ওরা কি মজা লুটছে—মাঝে থেকে আমিই বাদ পড়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

জবাব শুনে বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠলো। নিজের ব্যভিচারিতার পেছনে তাহলে কোনো অনুশোচনাও নেই। উল্টে বুদ্ধির সংস্পর্শ বিবর্জিত এইসব অর্থহীন আমোদ-প্রমোদে বড়াই করেন তিনি। একেবারে নিরেট প্রেয়োবাদী। একেই বলে সুবিধাবাদী গর্দভ।

এই শিল্পী সম্পর্কে আরও অনেক অপ্রিয় ঘটনা বলা যায় কিন্তু তোমার সঙ্গে তো তাঁর কোনো যোগ নেই। তাছাড়া আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার কথাও মনে পড়ে। তারই জন্য হঠাৎ বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে যে এখুনি ছুটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে একবার মদ খেতে ইচ্ছে হয়। তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো অনীহা নেই। ভদ্রলোকের অনেক ভালো গুণও আছে। যাক তাঁর কথা আর নয়।

শুধু তোমায় জানিয়ে যাবো দিনের পর দিন তাঁর স্ত্রীর জন্য নিষ্ফল কামনায় কেমন ক'রে জ্বলে-পুড়ে মরেছি। ব্যস্ এই পর্যন্ত। কিন্তু একটা কথা এরপর তুমি যেন তোমার ভাই-এর মনস্কাম পূর্ণ করার আশায় জীবিতকালীন এই ব্যর্থ প্রেম মরণের পর কারো দ্বারে পৌঁছে দিয়ো না। তুমি তো জানলে, জেনে মনে মনে বললে, "ওঃ তাই বুঝি? এই ব্যাপার?"—সেই যথেষ্ট। আরও একটি আশা আছে।—এই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি ফলে আর কেউ না বুঝুক অন্তত তুমি বুঝবে কী নিদারুণ যন্ত্রণায় আমার জীবন কেটেছে!

একবার স্বপ্ন দেখলাম আমি তার স্ত্রীর হাত ধরে আছি। তখনই বুঝলাম, অনেকদিন আগেই আমি তাঁর হৃদয়ে স্থান পেয়েছি। ঘুম ভাঙার পর তার আঙুলের স্পর্শ আমার হাতে জড়িয়ে ছিলো। মনে মনে স্বীকার ক'রে নিলাম এইটুকুই আমার পাওনা, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু অর্ধোন্মাদ—না—বিকার-গ্রস্ত শিল্পীকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। সেই মেয়েকে ভোলার জন্য আমি হৃদয়ের আগুন নিয়ে ঝাঁপ দিলাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর কামনার মধ্যে। যে কোনো মেয়ে নিয়ে এরকম উন্মত্ততায় সেই শিল্পীও একদিন আমার ওপর বিরক্ত হলেন। কিন্তু আমি চাইছিলাম তার স্ত্রীর মোহবন্ধন ছিন্ন করতে। কিন্তু কোনো ফল হলো

না। আমার মতো মানুষ দুবার প্রেমে পড়ে না! হলপ ক'রে বলতে পারি যে তারপর থেকে কোনো বান্ধবীকে তার চেয়ে সুন্দরী মনে হয়নি, মনে হয়নি তার চেয়ে প্রেমময়ী।

কাজুকো।

মৃত্যুর আগে একবার তার নাম লিখে যাবো।

শুগা।

এই তার নাম।

গতকাল আমি এক বাঈজীকে (একটি আকাট মূর্খ) এখানে এনেছি যার প্রতি আমার কণামাত্র দুর্বলতা নেই। শিগগিরই মরতে যে হবেই, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম, কিন্তু আজ সকালেই যে যাবো এমন কথা ভাবিনি। মেয়েটিকে আজ ভোরে এখানে আনার কারণ হলো এই যে সে গাড়ি চড়ে বেড়াতে চেয়েছিলো, আমিও টোকিও শহরে অনাচারে ক্লান্ত হয়ে দিন দুয়েকের জন্য বোকা মেয়েটির সঙ্গে এখানে জুড়িয়ে যাবো ভেবেছিলাম জানতাম, তোমার খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু তবু দুজনে শেষ পর্যন্ত চলেই এলাম। তুমি যেই টোকিওতে চলে গেলে, অমনি মনে হলো, "মরতেই যদি হয়, তবে এই তো সুযোগ।"

আগে মনে করতাম নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়িতে আমার নিজের ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যাবো। পাঁচজনের আড্ডাখানায় মরলে, তারপর যে-সে এসে আমার মৃতদেহ স্পর্শ করবে, একথা ভাবতেও বিতৃষ্ণা হতো। কিন্তু আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ি বেহাত হয়ে গেছে, এখন এখানেই মরা ছাড়া উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যখনই মনে হতো আমার মৃতদেহ তোমারই চোখে প্রথমে পড়বে এবং তুমি কতোদূর বিচলিত হবে, তখনই মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিধা এসেছে—হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার মরা হবে না।

কিন্তু আজ পেয়েছি অপূর্ব সুযোগ। তুমি এখানে নেই, একটা নিরেট বোকা নাচওয়ালি—আমার আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী।

গতরাত্রে আমরা একসঙ্গে বসে মদ খেলাম। তারপর তাকে তেতলার বিদেশী কেতায় সাজানো ঘরটাতে শুতে দিলাম। আমি নীচে এসে মা যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেখানে আমার বিছানা পেতে নিলাম। তারপর এই উঞ্ছজীবীর ইতিবৃত্ত লিখতে বসেছি।

কাজুকো

আর কোনো আশা নেই, বিদায়।

শেষ বিশ্লেষণে কিন্তু আমার মৃত্যু স্বাভাবিক। শুধুমাত্র আদর্শের খাতিরে বাঁচা অসম্ভব। একটা অনুরোধ করতে খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে। মনে আছে—মায়ের একটা তসরের কিমনো আসছে গ্রীষ্মে আমার কাজে লাগবে ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছিলে? সেখানা আমার কফিনে দিয়ে দিও। ওটা আমার পরবার বড়ো সাধ ছিলো।

রাত ভোর হয়ে এলো। অনেকক্ষণ ভোগালাম।

বিদায়!

গতরাত্রের নেশার আমেজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। শেষ সময়ে আমি শান্ত ভাবেই মরবো।

আবার বিদায় নিচ্ছি।

কাজুকো।

হাজার হোক, আমি অভিজাত।

অষ্টম অধ্যায় | বলি

দুঃস্বপ্ন।

একে একে সবাই আমাকে ছেড়ে গেলো।

নাওজির মৃত্যুর পর এক মাস আমি দেশের বাড়িতে একা-একা সব দিক সামলালাম।

তারপর হতাশায় বুক ভ'রে মিঃ উয়েহারাকে আমার শেষ চিঠি লিখলাম।

মনে হচ্ছে আপনিও আমাকে ত্যাগ করেছেন। না, বোধহয় ক্রমশ আমায় ভুলতে বসেছেন।

কিন্তু আর কোনো দুঃখ নেই। এতোদিনে সাধ মিটেছে, আমি সন্তানসম্ভবা। আজ সব-হারানোর দিনে সব-পাওয়ার আনন্দ বয়ে এনেছে আমার ভেতরের ক্ষুদ্র প্রাণটুকু।

একে আমি "দারুণ ভুল" বা ঐ জাতীয় কিছু ব'লে স্বীকার করবো না। ইদানীং আমার কাছে দুনিয়ার সব কিছু ব্যাপার—যুদ্ধ, শান্তি, সংঘ, বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদির রহস্য ঘুচে গেছে। আমার মনে হয় না আপনি এর কিছু বোঝেন। সেইজন্য আপনি সর্বদা কেমন যেন বিষণ্ণ। আমি বলছি কেন। —এ সবের কারণ হলো, যুগে যুগে নারী সুস্থ-সবল শিশুর জন্ম দেবে।

প্রথম থেকেই আপনার চরিত্র ও দায়িত্বজ্ঞানের ওপর আমার বিশেষ আস্থা ছিলো না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, আমার এই একাগ্র প্রেমের অভিযানে জয় লাভ করা। এখন যখন আমার বাসনা চরিতার্থ, তখন গভীর অরণ্যের স্তব্ধ জলাভূমির মতো আমার হৃদয়ও প্রশান্তিতে ভ'রে উঠেছে।

আমি জানি আমারই জয় হয়েছে।

মেরি যে সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তা যদি তাঁর স্বামীর না-ও হয়, তবু এক মাত্র মাতৃহৃদয়ের গর্বে মেরি ও তাঁর সন্তান দেবমাতা ও দেবশিশুর আসনে অধিষ্ঠিত।

বিবেকের সম্পূর্ণ সমর্থনে আমি সনাতন নীতি অগ্রাহ্য করেছি এবং ফলস্বরূপ আমি একটি সুস্থ সন্তানের জননী হবার পরিতৃপ্তি পাবো।

আশাকরি আমাদের শেষ দেখা হবার পরও আপনি আগের মতোই নর-নারী পরিবেষ্টিত হয়ে "গিলোটিন গিলোটিন" সুর সহযোগে সুরার বন্যার ভেতর দিয়ে অবক্ষয়ের পথে চলেছেন।

"এই নারকীয় জীবনধারা পরিবর্তিত করুন', একথা বলবো না। সম্ভবত আপনার শেষ সংগ্রাম এই পথেই চলবে।

"মদ খাওয়া ছেড়ে দিন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে তাকান, দীর্ঘায়ু হোন, আপনার অপূর্ব শিল্পসমৃদ্ধ জীবনের সম্ভাবনা পূর্ণ করুন" বা ঐ জাতীয় কোনো ভণ্ড অনুরোধ করার আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। যতোদূর মনে হয় আপনার "অপূর্ব সমৃদ্ধ" জীবনের জন্য নয়, আগামী দিনের মানুষ আপনার নিরবচ্ছিন্ন ব্যভিচারিতার জন্যই আপনাকে মনে রাখবে বেশি।

বলি। যুগসন্ধির নীতিবোধের বলি। আমরা দুজনেই তাই।

জগতের কোথাও বিপ্লব বেধেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেকেলে নীতিজ্ঞান আজও অব্যাহত অবস্থায় আমাদের চতুর্দিকে বিরাজ করছে এবং আমাদের পথ আগলে বসে আছে। সমুদ্রের ওপরে তরঙ্গ যতোই উত্তাল হোক, কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে এর আঘাত পৌঁছোয় না। সেখানে ঘুমের ভান ক'রে জলধি নিঃশব্দে কালের পদধ্বনি শুনছে।

কিন্তু বোধহয় আমার এই প্রথম প্রণয়ের দ্বারাই আমি প্রাচীন বিধি-নিষেধের বেড়া যৎসামান্য উল্লঙ্ঘন করতে পেরেছি এবং আমার ভাবী সন্তানের হাত ধরে দ্বিতীয়, তৃতীয়তম যুদ্ধে অগ্রসর হবো।

যাকে ভালোবাসি, তার সন্তানের জননী হওয়া এবং তাকে মানুষ ক'রে তোলাই হবে আমার নৈতিক অভিযানের সার্থক পরিণতি।

আপনি যদি আমাকে ভুলে যান, মদের পঙ্কে ডুবে যদি আপনার মৃত্যু হয়ও, তাহলেও আমার মনে হয় আমি সুস্থ সবল শরীরে বেঁচে থাকতে পারবো, কেননা আমার বিদ্রোহ সার্থক হয়েছে।

অল্প কিছুদিন আগে আমি একজন লোকের কাছ থেকে আপনার চারিত্রিক অপদার্থতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। যাই হোক আপনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন

আমার অন্তরে বিদ্রোহের রামধনু এঁকে দিয়েছেন। আমার বেঁচে থাকার প্রেরণাও আপনিই জুগিয়েছেন।

আপনার সম্বন্ধে আমার মনে যে গর্ব আছে তার বীজ আমি আমার সন্তানের মধ্যে বপন ক'রে দেবো।

জারজ সন্তান ও তার মা!

সূর্যের মতো প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।

আপনিও আপনার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।

এ বিপ্লবের এখনো অনেক দেরি। আরো, আরো অনেক অমূল্য প্রাণের বলিদান চাই।

জগতে বলি হবার মতো সুন্দর কিছু নেই।

আরো একটি তুচ্ছ বলি হলো।

মিস্টার উয়েহারা।

আপনার কাছে আর আমার কোনো কাম্য নেই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণটির হয়েই আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি।

আমি চাই আমার সন্তানকে অন্তত একবার যেন আপনার স্ত্রী কোলে তুলে নেন, আর আমি এই কথা বলি, "নাওজি এই ছেলেকে পেয়েছে কোনো এক মেয়ের সঙ্গে গোপন মিলনের ফলে।"

কেন এমন করবো? এর কারণ আমি কাউকেই বলতে পারবো না। না, কেন তা আমি নিজেও ঠিক জানি না। কিন্তু দয়া ক'রে এটুকু আপনাকে করতেই হবে। দয়া ক'রে সেই তুচ্ছ বলি নাওজির কথা ভেবে এটুকু করবেন।

বিরক্ত হলেন? হলেও ক্ষমা করবেন। একজন পরিত্যক্তা নারী, যে স্মৃতি থেকে স'রে যাচ্ছে, ধরে নিন, এটিই তার একমাত্র অপরাধ।

আমার মাথা খান—কথা রাখুন।

এম, সি, সমীপেষু, আমার কমেডিয়ান।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-সাহিত্যের তালিকা করবার কালে টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কির লেখার কথাই প্রথমে মনে আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে জাপানী ঔপন্যাসিক লেডী মুরাসাকির 'টেল অব গেন্‌জি'র উল্লেখ না করে পারা যায় না। তাই আশ্চর্য হবার কিছুই থাকে না যখন সেই মায়াময়, সাগর-ঘেরা সৌন্দর্যের দেশ জাপান থেকে কোনো নূতন সাহিত্য-প্রতিভার উদয় হয়। সৌন্দর্য ও শিল্পরসিকদের কাছে জাপান কেবল পীঠস্থানই নয়, এ সেই দেশ যা চোখে দেখার পর আধুনিক জগতের কামরূপ পারীর শিল্পীর কণ্ঠেও শোনা যায় বিলাপের সুর—আহা, কেন এতদিন এখানে আসি নি!

উত্তর জাপানের প্রতিপত্তিশালী এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ওসামু দাজাইয়ের জন্ম হয়। এ কথা প্রায় সত্য বলেই মেনে নিতে হয় যে, প্রকৃত প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আপস বড় একটা হয় না। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় দাজাইয়ের জীবনে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর ফরাসী সাহিত্য বিভাগে কেবল মাত্র নাম লিখিয়ে রেখে সাহিত্যচর্চা ও বামপন্থী আন্দোলনে কাটিয়ে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখান থেকে বিদায় নিলেন দাজাই।

ইতিমধ্যে তাঁর ছোটগল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেগুলিতে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় থাকলেও তাঁর প্রতিভা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে গত মহাযুদ্ধের পর। ছোটগল্প-গ্রন্থ 'ভিলন্‌স ওয়াইফ' এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দি সেটিং সান' (অস্তগামী সূর্য) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসিক সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অল্পকালের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করলেও জাগতিক সুখের অংশ গ্রহণ করতে তিনি পারেন নি। জাপানের র‍্যাঁবো নামে খ্যাত দাজাই একাধিকবার এই জগৎ থেকে বিদায় নেবার চেষ্টা করে সফলকাম হন নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তামাগাওয়া জলাধারে রোগজীর্ণ দেহকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর তাপদগ্ধ জীবনে যবনিকাপাত করেন।

কল্পনা রায়

কল্পনা রায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের বিখ্যাত বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। স্কুল-কলেজের পত্রিকায় বিদেশী কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা ও গল্প অনুবাদ করেই তাঁর সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি বি. এ. পাশ করেন।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি শ্রীমতী রায়ের বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় ম্যারী স্টোপ্‌স্, ফ্রাঁসোয়া সাঁ গ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতির গ্রন্থের অনুবাদ থেকে।